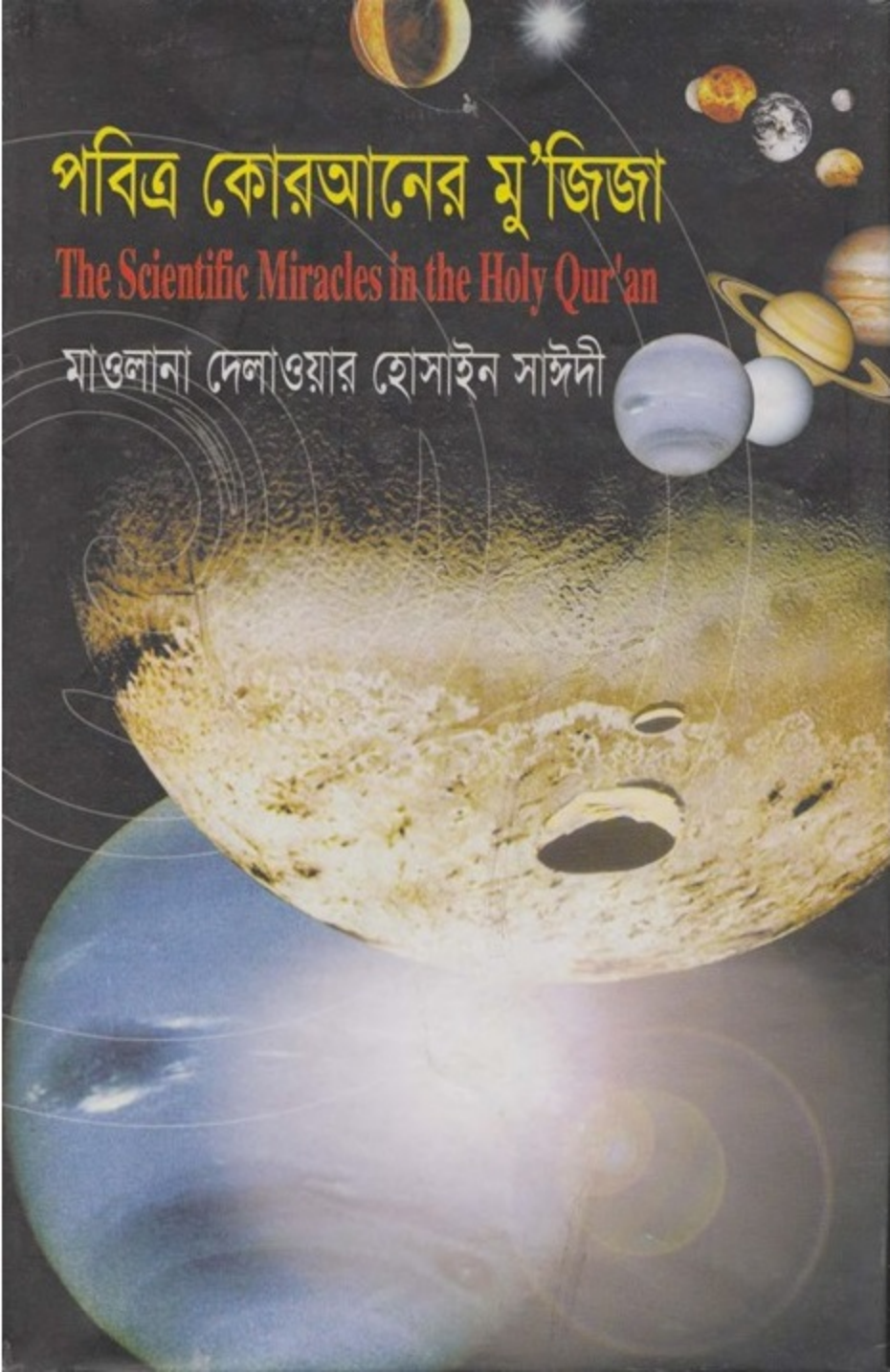
পবিত্র কোরআনের মু'জিজা
The Scientific Miracles in the Holy Qur'an
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

''তারা কি মনোযোগ সহকারে কোরআন নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলো তালা লাগানো রয়েছে?'' (সূরা মুহাম্মাদ- ২৪)

www.pathagar.com

পবিত্র
কোরআনের মু'জিজা

The Scientific Miracles in the Holy Qur'an

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের মু'জিজা

The Scientific Miracles in the Holy Qur'an

প্রকাশক ঃ	রাফীক বিন সাঈদী ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯
অনুলেখক ঃ	আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ ঃ	নভেম্বর-২০০৮
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ	নাবিল কম্পিউটার ৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, ০১৭১৪-৩৮৮২৫৪
প্রচ্ছদ ঃ	মশিউর রহমান
মুদ্রণ ঃ	আল আকাবা প্রিন্টার্স ৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ	১৫০ টাকা মাত্র। (অফসেট) ১০০ টাকা মাত্র। (সাদা)

The Scientific Miracles in the Holy Qur'an by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Managing Director of Global publishing Network, Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. 1st Edition: November 2008. Price: 150 and White 100 TK, Only in BD. 3 Doller in USA. 2 Pound in UK.

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

আমার উত্তরাধিকারী

যাদেরকে আমি

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের

আলোয় উদ্ভাসিত দেখতে চাই

আমার একান্ত আদরের নাতী- নাতনীঃ–

তাসনুভা তামান্না সাঈদী

ইশরাত লুবায়না সাঈদী

মাহ্‌দী হোসাইন সাঈদী

মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদী

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাঈদী

মাহীর মানাযীর সাঈদী

ইউসুফ নাযীল সাঈদী–

সহ অনাগতদের উদ্দেশ্যে.....

দাদাজী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যা বলতে চেয়েছি

বিগত এক যুগ ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সৌন্দর্য্য মন্ডিত নগরী আরব আমিরাতের দুবাই শহরে সরকারী উদ্যোগে খুবই জাকজমক সহকারে দুবাই **Dubai international holy Qur'an award** অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুবাই আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন হিফ্য প্রতিযোগিতায় সমগ্র বিশ্বের ৭০/৭২টি দেশের বাছাইকৃত সেরা হাফেযগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে দুবাই সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণকেও দাওয়াত দিয়ে থাকে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইর শাসক শেখ মুহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাকতুম উক্ত অনুষ্ঠানের ১২ বছর পূর্তি (যুগপূর্তি) উপলক্ষ্যে আমাকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাঠান। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বেও তিনি আমাকে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আরো দু'বার বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বর ২০০৮ সনে ১২ তারিখে পবিত্র রমযান মাসে দুবাই জাতিয় ঈদগাহ্ ময়দানে দুবাই সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বিশাল মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আমি ২০০৮ সনের অগাষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলাম। পবিত্র মদীনা থেকে রমযানের ১০ তারিখে দুবাই রওয়ানা হই এবং দুবাইতে সপ্তাহকাল অবস্থান করে ১৬ই রমযান পবিত্র শহর মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করি।

আরব আমিরাত সরকার কর্তৃক আয়োজিত উক্ত দুবাই মাহফিলে আমার বক্তব্যের বিষয় ছিলো **'পবিত্র কোরআনের মু'জিজা বা The miracle of holy Qur'an.** উপস্থিত অর্ধলক্ষাধিক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমি যে বক্তব্য রেখেছিলাম তা উপস্থিত বিজ্ঞ শ্রোতামন্ডলী ও আয়োজকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁদের পক্ষ থেকে জোর দাবী ওঠে– আমি যেনো আমার এ বক্তব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করি। ঈদুল ফিতর-এর পরে দেশে ফিরেই দুবাই মাহফিলে আলোচিত বিষয় গ্রন্থাকারে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমার বক্তব্য

www.pathagar.com

গ্রন্থাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে আলোচিত সমগ্র বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা নামটি অপরিবর্তিত রেখে ইংরেজী নামটি পরিবর্তন করে **The Scientific Miracles in the Holy Qur'an** নামকরণ করা হলো। বক্ষমান গ্রন্থটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইস্থ **আল সাইয়িরী কন্ট্রাকটিং কোম্পানী (এল. এল. সি)- এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ওসমান গণী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সর্বজনাব গিয়াস মিয়া, জমীর আলী, ফখরুল ইসলাম, আবুল হুসাইন চৌধুরী, ওবাইদুস সোবহান, মোহাম্মাদ উল্লাহ আজাদ, একরামুল হক, আব্দুল মালেক, শামসু আহ্‌মদ, মাঈন উদ্দীন, মোহাম্মাদ ইউসুফ, আব্দুর রউফ ও আব্দুল কাইয়ুম** প্রমুখ। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাঁদের সকলের নেক নিয়ত কবুল করুন– আমীন।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন সর্বকালের, সর্বযুগের সমগ্র পৃথিবীর জন্য এক মহাবিস্ময়। বিশ্ব মানবতার মুক্তিসনদ মহাপবিত্র এই কোরআন মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'য়ালার এক চিরন্তন ও শাশ্বত কিতাব। নবী করীম (সাঃ) এ কিতাব সম্পর্কে বলেন–

لَاتُحْصى عَجَائِبُه وَلَاتُبلى غَرَائِبُه فِيهِ مَصَابِيْحُ الْهُدى وَمَنَارِالْحِكْمَةِ–

'কোরআন কোনোদিন জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য্য ধরণের বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, কোরআন হচ্ছে হিদায়াতের মশাল এবং এই কিতাব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কূল-কিনারাহীন এক অগাধ জলধী। এর ভেতর রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অফুরন্ত তত্ত্ব ও অনায়ত্ব অসংখ্য দিক-দিগন্ত'।

মানবিয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞান সমুদ্র থেকে নিত্য-নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। প্রত্যেক অনুসন্ধানেই প্রতিটি যুগের সুক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যদি তারা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

www.pathagar.com

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ-

'এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করে সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সে সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।'

আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানব সভ্যতার সম্মুখে যে সকল থিউরী পেশ করছে, তা কোরআন বর্ণিত বৈজ্ঞানিক থিউরী সম্পর্কে অনবগত লোকদের কাছে অভিনব ও আশ্চর্য্যজনক বলে প্রতীয়মান হলেও কোরআন সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা-গবেষণা করেন, তাদের কাছে তা নতুন কিছু নয়। কোরআন অধ্যয়ন কালে তাঁরা প্রতিদিনই সমগ্র মহাবিশ্ব, মানব জাতি, অন্যান্য প্রাণীকুল তথা মানব কল্যাণে প্রযোজ্য সকল কিছুরই মূলনীতিসমূহ পবিত্র কোরআনে দেখতে পান। কোরআন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও গবেষণার অভাবের কারণেই কোরআন বর্ণিত অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক থিউরীসমূহ সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

সত্যানুসন্ধানী মন-মস্তিষ্ক নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল তথ্য পেশ করে মানব জাতিকে চমকে দিচ্ছে, এ সকল থিউরী চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছে এবং বারবার কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণার তাগিদ দিয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম মিল্লাতের– মুসলিম মিল্লাতের নেতৃবৃন্দ বিলাস খাতে অঢেল অর্থ ব্যয় করলেও কোরআন গবেষণা খাতে অর্থ ব্যয়ে সীমাহীন আলস্য এবং অনীহা প্রদর্শন করছেন, ফলে বর্তমানে চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কারের সকল দিক অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। আলস্য পরিহার করে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কোরআন গবেষণার ক্ষেত্র উন্মোচন করে মুসলিম বিজ্ঞানীদের কোরআন নিয়ে

www.pathagar.com

গবেষণা করার সকল দিক সহজ করে দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, সৃষ্টিসমূহের সকল সমস্যার সমাধানই রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে। আর এ পথই হবে পবিত্র কোরআনের দিকে আহ্বান জানানোর সবথেকে উৎকৃষ্ট পথ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে এ পথে অগ্রসর হবার তাওফীক দান করুন– আমীন।

আল্লাহ্ তা'য়ালার অনুগ্রহের একান্ত ভিখারী

সাঈদী

আরাফাত মন্‌জিল

৯১৪ শহীদবাগ

ঢাকা

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়

১৫ মহাবিশ্বের চির বিস্ময় আল কোরআন

১৯ অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ

২৩ অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস আল কোরআন

২৬ কোরআনকে বুঝার জন্য সহজ করা হয়েছে

৩০ কোরআন বিজ্ঞানকে পথ দেখায়

৩০ কোরআন ও বিজ্ঞান

৩৫ কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস

৩৬ বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল

৩৮ আল কোরআনে পৃথিবীর বর্ণনা

৪১ পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল ও কোরআন

৪৩ জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহ

৪৫ পৃথিবীর আকৃতি কেমন

৪৬ পৃথিবীর বায়ু মন্ডল

৪৮ বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প

৫০ আল কোরআন ও পানিচক্র

৫২ মহাকাশের মেঘমালা

৫৬ মহাকাশে অদৃশ্য ছাক্‌নি

৫৮ মেঘমালা থেকে বজ্রপাত

৫৯ পানির দুটো ধারা তথা পানি প্রাচীর

৬১ পানির তলদেশ, আল কোরআন ও বিজ্ঞান

৬৩ পানি থেকেই জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
৬৬	মাটির মৌলিক উপাদান
৬৭	মাটি চারটি পর্বে বিভক্ত
৬৯	মাটি নিয়ন্ত্রণসাধ্য
৭০	ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ
৭১	ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে
৭২	ভূপৃষ্ঠের কম্পন
৭৪	পৃথিবীর সৃষ্টি–দুর্ঘটনার ফসল নয়
৭৬	পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি
৮৮	আল কোরআন, মহাকাশ ও সাধারণ বিজ্ঞান
৯০	সুরক্ষিত মহাকাশ
৯২	উর্ধ্বজগতে ক্ষতিকর রশ্মি
৯৩	মহাকাশে শৃঙ্খলা
৯৫	মহাশূন্যে বাতাসের ঘনস্তর
৯৫	মহাকাশে পাথরের সাম্রাজ্য
৯৭	মহাকাশে বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য ছাতা
৯৮	গ্রহসমূহ কক্ষপথে সন্তরণশীল
১০১	ছায়াপথই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নয়
১০২	আকাশ একটি ছাদ বিশেষ
১০৩	আকাশের কোলে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি
১০৪	মহাকাশে চাঁদ-সূর্যের দুরত্ব
১০৬	সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদ

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
১০৮	সৌরজগতের পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে
১০৯	মহাকাশে সূর্যের পরিণতি
১১১	মহাকাশে ব্লাকহোল
১১২	মহাকাশে কোয়াসার
১১২	আদিতে আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল
১১৩	বহুমাত্রিক জগতের ধারণা
১১৬	দিন-রাতের আবর্তন ও বিবর্তন
১১৮	সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব
১২২	সম্প্রসারণশীল মহাজগৎ
১২৩	গ্যালাক্সিসমূহের পশ্চাদপসরণ
১২৪	সৃষ্টি জগতের নির্দিষ্ট পরিণতি
১২৫	আবরণ দীর্ণ করেই নব সৃষ্টি
১২৭	একই মোহনায় মিলন
১২৯	মানবদেহ গঠন পদ্ধতি
১৩৬	মাতৃদুগ্ধ শিশুর সর্বোত্তম ওষুধ
১৩৮	মানুষের নান্দনিক দেহ সৌষ্ঠব
১৪০	সকল প্রশংসা একমাত্র সেই মহাবৈজ্ঞানিকের
১৪৫	যাবতীয় সৃষ্টিতেই রয়েছে সুন্দরের ছোঁয়া
১৪৬	স্রষ্টার শৈল্পিক ও নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ
১৪৯	উপসংহার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহাবিশ্বের চির বিস্ময় আল কোরআন

মহাপবিত্র আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ১৩৯৮ বছর অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে ৬১০ খৃষ্টাব্দে। এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হবার সময়কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পবিত্র কোরআন নিয়ে কৌতুহলের শেষ তো হয়ইনি, বরং পবিত্র কোরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কূল-কিনারাহীন অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের সন্ধান পেয়ে অজানাকে জানার কৌতুহল ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। সেই সাথে এ কথা এখানে উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কোরআন অবতীর্ণ হবার যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর চলমান যুগ পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে যে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে, এ পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নিয়ে এর শতভাগের একভাগও গবেষণা হয়নি এবং হবার মতো কোনো গ্রন্থের অস্তিত্বও এই পৃথিবীতে নেই। কোরআন নিয়ে গবেষণার সমাপ্তি নেই এবং পৃথিবী ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত গবেষণা চলতেই থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আর মানুষ লাভ করতে থাকবে নিত্য নতুন তথ্য ও তত্ত্ব।

পৃথিবীর সর্বকালের, সকল শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ যে মহামানবের মাধ্যমে মানব সভ্যতা জীবন বিধান ও জ্ঞান সমুদ্রের অতুলনীয় মহাবিস্ময়কর গ্রন্থ আল কোরআন লাভ করেছে, সেই মহামানবকে জানার প্রচেষ্টা ও তাঁকে নিয়ে গবেষণারও সমাপ্তি নেই। বিশেষ করে বর্তমান এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে পৃথিবীর সকল স্থানেই সেই মহামানবের পবিত্র নামটিই সর্বাধিক শ্রদ্ধাভরে গবেষক ও চিন্তানায়কদের মুখে বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি ছিলেন নিরক্ষর, কোনো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তাঁর ছিলো না। পৃথিবীর কোনো শিক্ষাঙ্গন তাঁর পবিত্র চরণ ধূলির স্পর্শে ধন্য হয়নি এবং কোনো চিন্তাবিদ বা শিক্ষাবিদও তাঁর শিক্ষক ছিলেন না, তিনি কোনো গবেষণাগারে গবেষণাও করেননি। অক্ষর জ্ঞানের সাথেও তিনি পরিচিত ছিলেন না। তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মানবতার বন্ধু ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

এমন এক সমাজে ও পরিবেশে তিনি মাতৃগর্ভে থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে পবিত্র কোরআন লাভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০টি বছর প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যে সমাজ ও পরিবেশকে ঐতিহাসিকগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্বর ও মূর্খতার যুগ বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত সমাজে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামান্যতম ছোঁয়াও ছিলো না। মানব সভ্যতা ও আরব সম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখেন, তাঁরা অবগত আছেন মানব মন্ডলীর কোন্ ক্রান্তি লগ্নে

www.pathagar.com

মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পৃথিবীতে আগমন করে পাপ-পংকিলতার আবর্তে নিমজ্জিত তদানীন্তন আরব সমাজকে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত করেছিলেন। সমাজের যে মানুষগুলো ছিল চোর-ডাকাত, তারা হয়ে গেল মানুষের সম্পদের আমানতদার। যারা ছিল নারীর সতীত্ব হরনকারী, তারা হয়ে গেল নারীর সতীত্বের প্রহরী। যারা মানুষকে শোষণ করতো, তারাই নিজেদের সঞ্চিত ধনরাশি উন্মুক্ত হস্তে বিতরণ করে দিতে লাগলো দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে। তাদের আদর্শ, চরিত্র ও আমানতদারিতার আমূল পরিবর্তন যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সাধিত হলো, যে দর্শন দিয়ে তিনি সেই অধঃপতিত সমাজকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত করলেন তার নাম মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় আল-কোরআন।

পবিত্র কোরআন হচ্ছে পরশ পাথর। কোরআন নামক পরশ পাথরের ছোঁয়া লাগলো লৌহসদৃশ মানব হযরত উমার (রাঃ) এর শরীরে। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে হত্যা করতে এসেছিলেন। এ কোরআন নামক জীবন কাঠির ছোঁয়ায় তিনিই হয়ে গেলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে বললেন, 'আমার পরে কেউ নবী হবে না। যদি কেউ নবী হতো তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা উমারকে নবী বানিয়ে দিতেন।' মৃতপ্রায়- ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নবজীবন দান করলো এ পবিত্র কোরআন। এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন মরুচারী রাখালদের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বানিয়ে দিলো, বেদুঈনদের ন্যায় বিচারক শাসক বানিয়ে দিলো, উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে পরিণত করলো শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী জাতিতে।

সুতরাং ভাবতে অবাক লাগে, একজন নিরক্ষর মানুষের মুখ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে মহাবিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিলো, সে কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করছে বর্তমানের আধুনিক জ্ঞান গবেষণাগারের গবেষক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীগণ। যাঁরা বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কিত নিত্য- নতুন তথ্য ও তত্ত্ব মানব সভ্যতার সম্মুখে পরিবেশন করে মানব জাতিকে বিস্মিত করছেন, সেই তাঁরাই যখন পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন, বিস্ময়ের ধাক্কায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছেন। অঢেল অর্থ, ধন-সম্পদ ব্যয় করে শতাব্দী ব্যাপী গবেষণাগারে গবেষণা করে মহাবিশ্ব, প্রাণী জগৎ ও অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ সম্পর্কিত যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব তাঁরা জানতে পারছেন, সেই কথাগুলোই অধিক ও অকাট্য সত্যাকারে, অখন্ডনীয় বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে এবং সর্বাধিক নির্ভরশীলতায় বিগত প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে মরুচারী নিরক্ষর একজন মানুষের মুখ থেকে কিভাবে উচ্চারিত হয়েছিলো!

www.pathagar.com

সে যুগে ছিলো না কোনো গবেষণাগার এবং জ্ঞান গবেষণার আধুনিক উপকরণ, যে মানুষটি ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন, যাঁর পক্ষে কোনো কিছু লিখা বা সৃষ্টি সম্পর্কে আবিষ্কার করার সামান্যতম সুযোগ ছিলো না, কোনো চিন্তাবিদ, জ্ঞানী, গবেষক বা শিক্ষাবিদের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। তাহলে সেই মানুষটির মুখ থেকে কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুদ্ঘাটিত তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছিলো?

এ ধরণের অগণিত প্রশ্ন মনের গহীনে উদিত হবার সাথে সাথে জ্ঞান-গবেষকদের মন-মস্তিষ্কে আরেকটি প্রশ্ন আলোড়ন তুলেছে, সে প্রশ্নটি হলো 'তাহলে কোরআন কি? মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস অনুযায়ী কোরআন কি শুধুই ধর্মগ্রন্থ? কোরআন যদি শুধু ধর্মগ্রন্থ হয়ে থাকে, তাহলে এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বই বা কি?'

এসব চিন্তা সত্যানুসন্ধিৎসু সন্ধানীদের চোখের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। চিন্তা-ভাবনার অকুল সমুদ্রে তাঁরা খেই হারিয়ে অবশেষে কোরআন নিয়ে গবেষণায় রত হয়েছেন। গবেষণার এক পর্যায়ে কেউ কেউ মহাসত্যের স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। কেউ বা পার্থিব স্বার্থের কারণে মুখ না খুলে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

মুসলিমরা হচ্ছে সেই সৌভাগ্যবান জাতি, যাদের হাতে রয়েছে সেই পবিত্র কোরআনুল কারীম। আবার এ পবিত্র কোরআনকে যারা অমান্য করে, অনুসরণ করে না, তারা হলো সবচেয়ে বড় হতভাগা জাতি। যে জাতির কাছে আছে অকৃত্রিম কোরআন সে জাতি আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে হতভাগ্য। কারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী কোরআন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। যে উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, উক্ত উদ্দেশ্যের বিষয়টিই সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রায় ভুলে গিয়েছে।

আর আজকের পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমান হলেও আজ তারা নিগৃহীত, নির্যাতিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত। সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানরা অত্যাচারিত হচ্ছে। প্রায় সকল মুসলিম দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। প্রতিদিন পাখির মত গুলী করে শহীদ করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور

www.pathagar.com

عدوكم المهابة منكم وليقذ فن قلوبكم الوهن قال قائل يارسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت– (ابوداؤد)

হযরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে, যেমন ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের দিকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য থাকবো যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য অগ্রসর হবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন– না, বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার পানির ফেনা সমতুল্য। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন তোমাদের মনে তাদের ভয় সৃষ্টি করে দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমাদের মনে এ দুর্বলতা ও ভীতি দেখা দেয়ার কি কারণ হবে? তিনি বললেন, যেহেতু সেদিন তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (আবু দাউদ)

এই হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত লোকের সংখ্যা হবে অগণিত। কিন্তু তাদের ঈমানী শক্তি থাকবে না, তারা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দিবে। ইসলামের শত্রুদের আনুগত্য করে হলেও ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামের দুশমনরা সংখ্যায় অল্প হলেও তারাই মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন করবে, মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণ করাকে মুসলমানরা পসন্দ করবে না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে থাকবে যে, তাদের চোখের সামনে অন্য মুসলিম নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ দুশমনদের হাতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে, কিন্তু তারা মৌখিক প্রতিবাদও করবে না। মুসলমানরা নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, শক্তি-মত্তা ইসলামের দুশমনদের অধীন করে দিবে। নিজেদের অর্থ-সম্পদ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুকে পরাজিত করার মন-মানসিকতা মুসলমানদের থাকবে না, যদিও তারা সংখ্যায় হবে বিপুল। পবিত্র কোরআনের বিধান অনুসরণ না করার কারণে আজ এই অবস্থা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের হিদায়াত করুন।

www.pathagar.com

আধুনিক জ্ঞান-গবেষণাগারে পবিত্র কোরআন সম্পর্কিত যে গবেষণা হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের যে কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করছে, আমি তা থেকে যৎকিঞ্চিত পরিবেশন করার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাবো ইন্‌শাআল্লাহ।

অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ

মহাপবিত্র আল কোরআন যে মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়, এ সত্যের স্বীকৃতি বহু সংখ্যক অমুসলিম চিন্তাবিদগণ দিয়েছেন। পৃথিবী বিখ্যাত গ্রন্থ On Heroes and Hero worship এর রচয়িতা টমাস কার্লাইল, Muhammad and Muhamadanism গ্রন্থের রচয়িতা রেভারেন্ড আর বসওয়ার্থ স্মিথ, Decline and fall of the Roman Empire এর রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা গিবন, The Lord Jesus in the Koran এর রচয়িতা জে, শিল্লিডি, ডি, ডি, The Hundred এর রচয়িতা ডঃ মাইকেল এইচ হার্ট, দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শ, জন ডেভেন পোর্ট, এ, জে, আরবেরী, ফিলিপ হিট্টি, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীসহ বহু সংখ্যক চিন্তানায়ক, গবেষক, ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দিলেও অনেকের ভাগ্যেই মহাসত্য কবুল করার সৌভাগ্য হয়নি।

পবিত্র কোরআনের সম্মোহনী শক্তি, গবেষণা ও ব্যাখ্যা, শৈল্পিক চিত্র, কোরআনে বর্ণিত মনোজাগতিক চিত্র, মানবিক চিত্র, বিধানাবলী, সংঘটিত বিপর্যয়ের চিত্র, শাস্তি ও শাস্তির দৃশ্যাবলী, কোরআনে অঙ্কিত কল্পনা ও রূপায়ণ, শৈল্পিক বিন্যাস, শৈল্পিক বিন্যাসের ধরন, এর সুর ও ছন্দ, বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল, কোরআনে বর্ণিত চিত্রের উপাদান, বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বিশাল কাহিনীর সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি, উপসংহার ও পরিণতি বর্ণনা, কাহিনী বর্ণনায় শৈল্পিক সংমিশ্রণ, কাহিনীর শৈল্পিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য, বর্ণনার বিভিন্নতা, কাহিনী বর্ণনায় আকস্মিকভাবে রহস্যের দ্বার উন্মোচন, দৃশ্যান্তরে বিরতি, ঘটনার মাধ্যমে দৃশ্যাঙ্কন, আবেগ অনুভূতির চিত্র, কাহিনীতে ব্যক্তিত্বের ছাপ, কোরআনের বর্ণনা রীতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষা, ১৯ সংখ্যার অকল্পনীয় রহস্য ইত্যাদি মুযিজা বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে। ফলে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'এ মহাগ্রন্থ অবশ্যই মানব রচিত নয়'।

পৃথিবীতে যে কয়টি গ্রন্থকে 'ধর্মগ্রন্থ' হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়, এর একটি গ্রন্থও 'নিজেকে নির্ভুল, এ গ্রন্থের একটি শব্দের প্রতি সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই,

www.pathagar.com

যদি সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীর সকলে সকল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একটি গ্রন্থ বা এই গ্রন্থে বর্ণিত ছন্দের অনুরূপ একটি ছন্দ রচনা করো আনো।'

এ ধরণের দুঃসাহসিক ও অনতিক্রম্য চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আল কোরআন। পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে দেশে ও পরিবেশে তা অবতীর্ণ হয়েছিলো, সে যুগে আরবী সাহিত্য ছন্দ ও অলঙ্কারিক দিক থেকে সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছিলো। যাদের সম্মুখে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের মধ্যে আরবী ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় পন্ডিত ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরাও ছিলো। বর্তমানেও জন্মসূত্রে আরবী ভাষী এবং আরবে বসবাস করেন চৌদ্দ মিলিয়নের বেশী খৃষ্টান। আরবী ভাষী ইয়াহূদীদের সংখ্যাও কম নয়। সেই আরবী ভাষাতেই প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه ص وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ–

আমি আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তার সত্যতা সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয় তাহলে যাও, তার মতো করে একটি সূরা তোমরাও রচনা করে নিয়ে এসো, এক আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব আছে প্রয়োজনে তাদেরকেও সহযোগিতার জন্য ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা বাকারা-২৩)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ، قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِه وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

তারা কি এ কথা বলে, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ স.) এ গ্রন্থটি রচনা করে নিয়েছে, (হে নবী) আপনি এদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে চাও তাদেরকে ডেকে সাহায্য নাও। (সূরা ইউনুস- ৩৮)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِه مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ

www.pathagar.com

اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ–

অথবা এরা কি এ কথা বলে, (মুহাম্মাদ স. নামের ব্যক্তি) কোরআন নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি তাই মনে করো তাহলে নিয়ে এসো এর অনুরূপ মাত্র দশটি স্বরচিত সূরা এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্য ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা হূদ- ১৩)

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ–

তারা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তারাও এ কোরআনের মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে আসুক না! (সূরা তুর- ৩৪)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا–

(হে নবী) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ কাজের জন্য একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ কোনো কিছু বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু বানিয়ে আনতে পারবে না, যদিও এ ব্যাপারে তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় তবুও নয়। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, কিন্তু বিগত চৌদ্দ শত বছরেও কারো পক্ষেই এ চ্যালে গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট্ট একটি সূরাও কোনো অবিশ্বাসীর পক্ষে বানানো সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে যে কয়টি গ্রন্থ ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বরিত হয়েছে আসছে, কেউ ইচ্ছে করলে উক্ত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন, কোনো একটি গ্রন্থেও এ ধরণের কোনো চ্যালেঞ্জ নেই।

প্রশ্ন হলো, কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী অসংখ্য আরবী ভাষী সাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ মানুষ তথা পন্ডিতবর্গ থাকার পরও কেনো তারা পবিত্র কোরআনের ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি?

এ প্রশ্নের জবাবও মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই দিয়েছেন–

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

www.pathagar.com

এ কোরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, আল্লাহর ওহী ব্যতিরেকে কারো ইচ্ছামাফিক বানিয়ে নেয়া যাবে। (সূরা ইউনুস- ৩৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী ব্যতিত এ ধরণের কোরআন বানানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ পবিত্র কোরআন নবী করীম (সাঃ) রচনা করেননি এবং কোনো মানুষের পক্ষেই তা রচনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের শিক্ষার জন্য যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তা অতীতের বা বর্তমানের কোনো ইতিহাস গবেষকই ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র মুখ উচ্চারিত এসব ঐতিহাসিক ঘটনা যাদের সম্মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো, তাদের মধ্যেও বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা হাজার বছর বা কয়েক শতাব্দী পূর্বের বর্ণিত ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কোরআন বর্ণিত ইতিহাস শুনে তাঁরা সামান্যতম আপত্তিও করেননি। বর্তমানে অজানাকে জানার জন্য পৃথিবীর ভূগর্ভ, স্থল ভাগ, জল ভাগ ও মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাঁদেরও কেউ কোরআন বর্ণিত ইতিহাস সম্পর্কে আপত্তি তোলার সাহস দেখাচ্ছেন না।

একমাত্র কোরআন ব্যতিত পৃথিবীর কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও 'গ্রন্থটি' সত্য বা মিথ্যা– তা প্রমাণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনো একটি ধর্মগ্রন্থে মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হলো, 'মাংসভোজী কোনো প্রাণী কখনো তৃণভোজী হবে না।' অর্থাৎ নিয়মটি অপরিবর্তনীয়। এখন কোনো মানুষ দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মাংসভোজী প্রাণীকে তৃণভোজী বানালো। অথবা হঠাৎ করেই কিছু সংখ্যক মাংষাশী প্রাণী তৃণভোজী হয়ে উঠলো।

অবস্থা যদি এ রকম হয়ই, তাহলে উক্ত ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠবে। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ অপরিবর্তনীয় মূলনীতি হিসেবে যা কিছু বর্ণনা করছে বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে সামান্যতম কোনো বৈপরীত্য নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا–

www.pathagar.com

এরা কি কোরআন (ও তার সূত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করেনা? এ গ্রন্থটি যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেতো। (সূরা আননিসা-৮২)

অনেক গড়মিল দূরে থাক, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গড়মিলও পবিত্র কোরআনে নেই এবং এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে গত চৌদ্দশত বছর পূর্বে। কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি সামান্য গড়মিল বের করা। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, 'গ্রন্থটি সত্য বা মিথ্যা' প্রমাণ করার ব্যবস্থা এক মাত্র কোরআন ব্যতিত কোনো গ্রন্থেই রাখা হয়নি।

এরপর দেখুন, কোরআনে যে বৈজ্ঞানিক থিউরী বর্ণনা করা হয়েছে, তাও আজ পর্যন্ত ভুল বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। পৃথিবীর সৃষ্টি, মহাকাশ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, মাধ্যাকার্ষণ শক্তি, ব্লাক হোল, গতিবিদ্যা, সম্প্রসারণ শক্তি, উল্কা পতন, মহাশূন্যে পাথরের সাম্রাজ্য, পৃথিবী ব্যতিত অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব, পৃথিবীর স্থল ভাগ, পাহাড়, বনভূমি, ভূগর্ভ, জল ভাগের তলদেশ, পানির উপাদান, মাটির উপাদান, লৌহ, খনিজ পদার্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য, আকরিক, তামা, প্রাণী জগৎ, মানবদেহ, মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতি গঠন, লিঙ্গ নির্ধারণ ইত্যাদি সম্পর্কিত কোরআনে বর্ণিত সূত্র কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেও কিয়ামত পর্যন্ত অস্বীকার করা সম্ভব হবে না।

কোরআন বিদ্বেষী কোনো গবেষক, চিন্তাবিদ বা বিজ্ঞানীও কোরআন বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সূত্র অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছেন না। কারণ তিনি প্রকৃত সত্য অস্বীকার করলে অন্য কোনো বিজ্ঞানী তা গবেষণার মাধ্যমে সত্য বলে মত প্রকাশ করবেন।

অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস আল কোরআন

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন এবং এই জ্ঞান দুই প্রকার। একটি ওহীর জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে দিয়েছেন। আরেকটি হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে অর্জিত জ্ঞান। চিন্তা-চেতনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। আমাদের কাছে যে জ্ঞান আছে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً –

(হে মানব জাতি!) তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান দান করা হয়েছে।

গোটা পৃথিবীর মানুষের যত জ্ঞান আছে, মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত এবং এখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত জ্ঞান আসবে, সমস্ত জ্ঞান এক জায়গায়

www.pathagar.com

করলেও আল্লাহ্ তা'য়ালার অনন্ত-অসীম জ্ঞানের মহাসমুদ্রের এক বিন্দু জ্ঞানের সমপরিমাণও হবে না। মহান আল্লাহ্ বলছেন, মানুষকে সামান্যতম জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আজ আমরা সে সামান্যতম জ্ঞানের কারণে কোথা হতে কোথায় চলে গিয়েছি। গরুর গাড়ি হতে রকেট, টেলিগ্রাফ, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়াবে সাইট হতে মোবাইল ফোন পর্যন্ত চলে গেছি। ই-মেইলে কথাগুলো লিখে বা ছবি দিয়ে কোড বাটনে চাপ দিলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে সে দেশের পত্রিকায় পূর্ণ ছবি এবং খবর ছাপা হবে। ক্ষুদ্রাকৃতির একটি সীম কার্ডের সাহায্যে মোবাইল ফোনে মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর অপরপ্রান্তে অবস্থানরত কারো সাথে সংবাদ আদান প্রদান করা যায়।

আরও আশ্চর্য হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্যাটেলাইট ছেড়ে দেয়া হয়েছে মহাশূন্যের ভেতরে। এ স্যাটেলাইট চালক ব্যতীত বছরের পর বছর ঘুরছেই। পৃথিবীর মাটি হতে প্রায় চারশত মাইল ওপর দিয়ে পৃথিবীর ছবি ও অন্যান্য তথ্য জানতে পারছে ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াগুলোয়। ঐ স্যাটেলাইটের যান্ত্রিক কোন গোলযোগ দেখা দিলে পৃথিবীর মাটিতে বসে বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে মনিটরিং করে চারশ' মাইল ওপরের মেশিন মেরামত করছে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান প্রদান করেছি। এ যদি হয় সামান্যতম জ্ঞান, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান কত বেশী!। সে মহামহিয়ান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ–

আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এসেছে আলো ও স্পষ্ট কিতাব।

এই আলো হচ্ছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আর কিতাব হচ্ছে পবিত্র কোরআন মাজীদ। 'কোরআন' শব্দের অর্থ যা বার বার পড়তে হয়, পবিত্র কোরআনে 'কোরআন' শব্দটি ৬৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 'কোরআন' সার্থক এক নাম এবং এ নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। কোরআনের তুলনায় পঠিত হয়েছে বা পাঠ করা হয় এমন গ্রন্থ সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকটি নেই। সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না, যে মুহূর্তে কোথাও না কোথাও কোরআন পাঠ করা হচ্ছে না। এ মহাগ্রন্থের আরেক নাম 'কিতাব' যার অর্থ লিখিত গ্রন্থ। এটিও পবিত্র কোরআনের আরেকটি সার্থক নাম এবং এ নামকরণও করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা। গোটা বিশ্বে কোরআনের তুলনায় লিখা হয়েছে বা ছাপা

www.pathagar.com

হয়েছে এমন কোনো গ্রন্থের নাম কেউই উচ্চারণ করতে পারবে না। এ মহাগ্রন্থের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে এবং এসব নামকরণও করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এই কোরআন যখন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হলো এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, তখন ইসলামের দুশমনরা বলতে লাগলো এই লোকটি পাগল হয়ে গিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ্)। নবী করীম (সাঃ) কে যখন পাগল বলা হলো তখন তিনি তাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর এলো আল্লাহর পক্ষ থেকে–

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ–

তোমাদের সাথী পাগল নন। (আল কোরআন)

আল্লাহর রাসূলের কোরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে মানুষ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো। পুরো ত্রিশ পারা কোরআন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। একটু একটু করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে কোনে বৈপরীত্য নেই, নেই কোনো দুর্বল সুত্র। জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা এ কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুর্বল বা মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে পরিবর্তনীয় কোনো জ্ঞানসুত্রও এ কিতাবে বর্ণিত হয়নি। মানুষের সকল প্রয়োজনে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা অকাট্য, অখন্ডনীয়, অপরিবর্তনীয়, মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, পালনে ও অনুসরণে সহজ সাধ্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও অভ্রান্ত। পবিত্র কোরআন অবতীর্ণের কাল থেকে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ কথা চর্চা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে, কোরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে তাই অকাট্য সত্য, অভ্রান্ত এবং এ কোরআনই কেবল মাত্র অপরিবর্তনীয় ও অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস।

অগণিত মানুষকে অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যয় করে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া ব্যবহার করে বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী চরম সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ আবহাওয়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্ষমতার দম্ভে হুমকি-ধমকি প্রদর্শন করে প্রকৃত সত্য গোপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তবে দুশমনদের জেনে রাখা ভালো, 'এ আকাশ চিরদিন মেঘে ঢাকা রবে না'। একদিন অবশ্যই আলোয় আলোয় ভরে উঠবে। সেই সোনালী আলোকচ্ছটায় সকলের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের অভ্রান্ত জ্ঞান মানুষকে মহাসত্যের দিকে ধাবিত করবে। আজ যা গোপন করা হচ্ছে, তা আগামীল অবশ্যই প্রকাশিত হবেই হবে। হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করে

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের অভ্রান্ত জ্ঞান থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে ক্রমশঃ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের কৃষ্ণকালো গহ্বরের দিকেই নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ অবস্থা থেকে মানব সভ্যতাকে পরিত্রাণ দান করুন।

কোরআনকে বুঝার জন্য সহজ করা হয়েছে

মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে পবিত্র কোরআনের আয়াত সংখ্যা, রুকুর সংখ্যা, পারার সংখ্যা, সূরার সংখ্যা, অক্ষরের সংখ্যা, শব্দ সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা কত ইত্যাদি। এ সকল কিছু কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারকে প্রশ্ন করা হয়েছে এটা মানুষের বানানো কি না? মানুষের পক্ষে কি এটা তৈরি করা সম্ভব? কম্পিউটার উত্তর দিয়েছে, সংখ্যা তথ্যের দিক হতে ভারসাম্যপূর্ণ এমন কিতাব মানুষের দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়।

সুতরাং পবিত্র কোরআন হলো মানুষের বেঁচে থাকার দলিল। এ কোরআন যেন নকল না হতে পারে সে জন্য কোরআনে কারীমকে মানুষের স্মৃতিশক্তির মধ্যে হেফাজত করার ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পৃথিবীর মানুষ যাকিছু রেকর্ড করে রাখে, তার উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করে তাহলে পূর্বের রেকর্ড করা সবকিছু মুছে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্মৃতির ভেতরে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাতে দুনিয়ার সকল কিছু যদি মুখস্থ করে রেকর্ড করে রাখা হয় তাহলে পূর্বেরটা মুছবে না।

এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আছে, যেমন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ। সমগ্র পৃথিবীতে বেদের একজন হাফেজ পাওয়া যাবে না। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, তাদের মধ্যে বাইবেলের একজন হাফেজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পবিত্র কোরআন ব্যতিত এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থের একজন হাফেজও খুঁজে পাওয়া যাবে। পবিত্র কোরআনুল কারীম মুখস্থ করার ও বুঝার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সহজ করেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ–

আমি এই কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণে কেউ প্রস্তুত আছে কি? (সূরা ক্বামার ঃ ১৭)

পবিত্র কোরনানের অন্যত্র বলা হচ্ছে–

الرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ–

www.pathagar.com

পরম করুণাময় আল্লাহ এই কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (আর্ রাহমান-১ - ৪)

وَمَا اَرْسَلْنَامِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ-

আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্য যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্টরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়। (সূরা ইবরাহীম-৪)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًالُّدًا-

হে রাসূল! এ বাণীকে আমি সহজ করে আপনার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মুত্তাকিদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সীমালংঘনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। (সূরা মারিয়াম)

কোরআনের বক্তব্যে বিন্দুমাত্র দুর্বোধ্যতা নেই। এ কিতাব যা বলে তা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে বলে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

تِلْكَ ايتُ الْكِتبِ الْمُبِيْنِ، اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًاعَرَبِيًّالَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

এটা সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আমি একে কোরআন রূপে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইউসুফ-১-২)

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًاعَرَبِيًّاوَّصَرَّفْنَافِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ-

হে রাসূল! এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি। (সূরা ত্বা-হা-১১৩)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ، قُرْاٰنًاعَرَبِيًّاغَيْرَذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

এ কোরআনের ভেতরে আমি মানুষের জন্য নানা ধরনের উপমা পেশ করেছি যেন

www.pathagar.com

তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কোরআন–যাতে কোন বক্রতা নেই। যাতে তারা নিকৃষ্ট পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। (সূরা যুমার–২৭-২৮)

এ কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর ভেতরে না বুঝার মতো কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُه قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ، بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ

এটা পরম দাতা ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কোরআন। সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ–২-৪)

وَلَوْجَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُه، ءَ اَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ–

আমি যদি একে অনারব কোরআন বানিয়ে প্রেরণ করতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য কথা, অনারব বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী! (সূরা হা-মীম-সাজদাহ–৪৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহাকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলেছেন–

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ–

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, আর নক্ষত্রমণ্ডলী যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (সূরা ইনফিতার- ১-২))

পবিত্র কোরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর্যায় ক্রমিক মেয়াদকাল সম্পর্কে বলা হচ্ছে–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ

www.pathagar.com

بَعْدِ اِذْنِهٖ، ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ–

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা ইউনুস-৩)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً، وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ–

আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। তুমি যদি বল, মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হবে। কাফেররা নিশ্চয়ই বলবে, তাতো সুস্পষ্ট যাদু। (সূরা হুদ-৭)

اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا–

তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রহমান তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। (সূরা ফুরকান-৫৯)

পবিত্র কোরআনে আলোচিত ও বর্ণিত সকল বিষয় একত্রিত করলে দেখা যাবে, সকল বিষয়ই অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এসবে কোনোই জটিলতা নেই। মানুষ সহজে যা বুঝে এবং মানুষের অনুভূতিতে ধরা পড়বে, সে পদ্ধতিতেই পবিত্র কোরআন তা বর্ণনা করেছে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে একাধিকবার বলেছেন, 'আমি এ কোরআনকে মানুষের বুঝার জন্যে অত্যন্ত সহজ করেছি।'

www.pathagar.com

কোরআন বিজ্ঞানকে পথ দেখায়

কোরআনের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কোরআনের বক্তব্যের মোটেই পরিপন্থী নয়। তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবী সৃষ্টির যাবতীয় পর্যায়ক্রমিক মেয়াদকাল, ব্যবস্থাপনাকে নিজ থেকেই বা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিচ্ছেন। আবার কেউ ভুল করছেন আরবী ভাষায় পারদর্শী না হবার কারণে। যেমন অনেকেই প্রশ্ন করেন, 'কোরআন বলছে পৃথিবী মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ছয়টি মেয়াদকালে বা ছয়টি স্তরে।' কোরআন পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে যেখানে ছয় দিনের কথা বলা হয়েছে সেখানে 'আইয়াম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী 'ইয়াওমুন' শব্দের বহুবচন হলো 'আইয়াম'। এর অর্থ হলো দিন বা অনেক দীর্ঘ সময় এমনকি যুগকেও বুঝায়। যেমন 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' অর্থাৎ মুর্খতার যুগ। আইয়াম বা ইয়াওমুন শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে এবং তা প্রয়োগও হয় যথার্থ ক্ষেত্রে। এ শব্দের অর্থ শুধু মাত্র দিন নয়, বিশেষ মেয়াদকালকেও 'আইয়াম' বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান যেখানে ভুল করেনি সেখানে কোরআনে ও বিজ্ঞানে কোন সংঘর্ষ নেই। আর যেখানেই বিজ্ঞান ভুল করেছে সেখানেই কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। বর্তমানে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এ যুগের জন্য অনুপযুক্ত বলে ভাবছে। এ জন্যে কোরআনের বৈজ্ঞানিক আলোচনার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি এ বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করাও বর্তমান সময়ের দাবী।

কোরআন ও বিজ্ঞান

সচেতন মহল মাত্রই অবগত আছেন, বিজ্ঞান তার পূর্ব ধারণা থেকে প্রায়ই ইউটার্ণ করে অবস্থান পরিবর্তন করে। আজ যে কথা বলে, ক্ষেত্র বিশেষে আগামী কাল বলে ভিন্নরূপ কথা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের সূত্র দিয়েছেন, কিন্তু পবিত্র কোরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়, অথবা এটি কোনো উন্নতমানের সাহিত্য গ্রন্থও নয়। বরং পবিত্র কোরআন হলো আয়াতের গ্রন্থ যা অগণিত নিদর্শনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। মহাগ্রন্থ আল কোরআন হিদায়াতের গ্রন্থ, যা মানুষকে সকল বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

মানুষের প্রয়োজনেই কোরআনে বস্তুজগৎ তথা বিজ্ঞানের বহু বিষয় আলোচিত

www.pathagar.com

হয়েছে। এখানেই কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। কোরআন প্রচলিত কোন ধর্মগ্রন্থ বা কোন বিষয়ের গবেষণামূলক গ্রন্থের ন্যায় মানব রচিত পুস্তক নয়। নবী করীম (সাঃ) পবিত্র কোরআন অবিকল যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন আজও তাই আছে। পৃথিবীতে কোরআনই একমাত্র মূল গ্রন্থ যা আজও অবিকৃত, যার কোন বিকল্প অনুলিপিও নেই। এ কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সকল মানুষকেই মহাসত্যের ব্যাপারে নির্ভুল পথ প্রদর্শন করবে, যে সকল মানুষ সত্যানুসন্ধিৎসু, সত্যের অন্বেষায় যারা ব্যকুল এবং সকল বিষয়েই যারা নির্ভুল সত্য জানতে আগ্রহী।

পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্বের মহাবিস্ময় এবং নবী করীম (সাঃ) এর এক জীবন্ত মুজিযা। এ কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সবকিছু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। মানব গোষ্ঠীর জন্য যা অত্যবশ্যকীয় তার সবকিছুর মূলনীতি নিশ্চিত করে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে– এ কিতাব চিরন্তন। আপনারা জানেন, আবহাওয়ার বার্তা বিভাগ থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়। যেমন– এই এলাকার ওপর দিয়ে এত মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং তার সাথে জলোচ্ছ্বাস ও বৃষ্টিপাতও হতে পারে।

আবহাওয়াবিদগণ একটি সম্ভাবনার কথা বলে থাকেন; কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, এই এলাকার ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হবেই। কোন বিজ্ঞানী একথা বলতে সাহস পাবে না। কিন্তু কোরআন যা বলেছে নিশ্চিত করেই তা বলেছে। যেমন–

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ–

আসমান যখন ফেটে যাবে। তারাগুলো যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সমুদ্র যখন দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। কবরগুলো যখন খুলে দেয়া হবে। (সূরা ইনফিতার-১–৪)

পবিত্র কোরআনে সম্ভাবনামূলক কোনো কথা নেই যে, আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে, কবরসমূহ হতে সকল প্রাণী উত্থিত হতে পারে ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয় নিশ্চিত করে বলেছেন। কোরআনে বর্ণিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই; সবই অকাট্য।

আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে যত সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সকল নবী-রাসূলের কথাই এক, কেউ দু'ধরনের কথা বলেননি। পৃথিবীর দার্শনিক ও

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কথা বলেছেন। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, মানুষ হচ্ছে পেট সর্বস্ব জীব। ফ্রয়েড বলেছেন, সেক্স সর্বস্ব জীব। ডারউইন বলেছেন, মানুষতো বানরের বংশধর। পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের একজনের কথার সাথে আরেক জনের কথার কোনো মিল নেই। আর হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের কথায় কোনো গড়মিল নেই। কেউ এ কথা বলেননি যে, পরকাল হতে পারে বা সকল মানুষের হাশরের ময়দানে হিসেব দিতে হতে পারে। এ ধরনের কোনো অনিশ্চিত কথা নবী-রাসূল বলেননি। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নিশ্চিত হয়ে বলেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা পাঁচটি গ্রহ একই সাথে একই রেখার মধ্যে যদি এসে যায়, তাহলে পৃথিবীর মানুষগুলো সমস্যায় পড়বে। কোরআনে কারীম সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই বলে তারা এমন চিন্তা করেন। এ পৃথিবীর কিছুই হঠাৎ করে ধ্বংস হবে না। এ গ্রহগুলো যদি সুতার মালার মত একটির পর আরেকটির পিছনে কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় তাহলেও দুর্ঘটনা ঘটবে না। কারণ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

রাত দিনকে অতিক্রম করবে না, চন্দ্র সূর্যকে ধরতে পারবে না, দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, সূর্য চন্দ্রকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না, সবগুলো তার আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ও স্বাতন্ত্রশীল থাকবে। (সূরা ইয়াসীন-৪০)

কোনো কিছুই স্থির নেই, সব কিছু ঘুরছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন অনেক পরে। কেউ বলেছেন সূর্য ঘুরছে, কেউ বলেছেন পৃথিবী ঘুরছে। আসলে যে কি ঘুরছে তা বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন না। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

আমি তোমাদেরকে একেবারে সামান্যতম জ্ঞান দান করেছি। (বনি ইসরাইল-৮৫)

এ পৃথিবীতে আমরা বাস করি পঁচিশ হাজার ব্যাসার্ধে (গোলার্ধে)। মহাশূন্যের দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাবো, এ মহাশূন্য কি- এটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনেকের ধারণা নেই। অবশ্য বিজ্ঞান নিয়ে যারা লেখাপড়া করেন, বিচার

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করেন, তারা জানেন মহাশূন্যের ভেতরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ইউরেনাস, নেপচুন, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও অন্যান্য গ্রহ যা কিছু আছে, তাদের আবার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সৌরজগৎ আছে। সৌরজগৎ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি ততটুকু নয়। বিশাল বিশাল সৌরজগৎ রয়েছে। অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে। আবার এ গ্যালাক্সির ভেতর বিলিয়ন বিলিয়ন তারকা রয়েছে। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়, এ রকম তিন কোটি সূর্য খেয়ে হজম করতে পারবে, গ্যালাক্সির ভেতরে সেরকম দৈত্য তারকা রয়েছে অগণিত। এরপর বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন হয়ত এটাই শেষ আবিষ্কার করলেন; কিন্তু না এটাই শেষ আবিষ্কার নয়, এর থেকেও আরো অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত রয়েছে। যেমন অদৃশ্য ব্লাক-হোল, যে সব তারকা তিন কোটি সূর্য খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে, সে দৈত্য তারকাগুলো ঘুরতে ঘুরতে যখন অদৃশ্য ব্লাক-হোলের আওতায় এসে যায়, তখন এমন দেখায় যে– মানুষ চকলেট চুষে নিঃশেষ করলে যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনই। যে তারকা পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় সে তারকাগুলো ব্লাক-হোল এর আওতায় এলে নিমিষে তা শেষ করে দেয়। এটা আবিষ্কার করছেন আজকের বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু কোন বিজ্ঞানাগারে লেখা পড়া না করে নবী করীম (সাঃ) সকল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী, যিনি লিখতে জানেন না, পড়তে জানেন না, যিনি নাম দস্তখত করতে জানেন না, যাঁকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتبُ وَلَا الايْمَانُ–

আপনি জানতেন না কিতাব কাকে বলে? আপনি একথাও জানতেন না ঈমান কাকে বলে? (আমি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি।) (সূরা শুরা-৫২)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّه بِيَمِنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ–

(হে রাসূল) ইতোপূর্বে আপনি কোনো কিতাব পড়তেন না এবং স্বহস্তে লিখতেনও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। (সূরা আনকাবূত)

নবী কারীম (সাঃ) এর শিক্ষক হচ্ছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তিনি তাঁকে শিখিয়েছেন। নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি শুধুমাত্র শিক্ষক হিসেবে।' তিনি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষক। তাঁর নিকট জ্ঞান এসেছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ হতে।

www.pathagar.com

ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, নবী কারীম (সাঃ) কোনো বিজ্ঞানাগারে লেখা পড়া করেননি, যিনি অন্ধকার যুগে এ পৃথিবীতে আগমন করে এমন এক কিতাব মানব সভ্যতাকে উপহার দিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা বিজ্ঞানকে আলোকিত করতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভিক্ষুকের মত কোরআনে কারীমের দরজায় হাত পেতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা ব্লাক-হোল আবিষ্কার করলেন বর্তমান যুগে, অথচ প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবী কারীম (সাঃ) এর পবিত্র মুখে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন–

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ –

শপথ করছি সে পতিত স্থানের যে স্থানে তারকাসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫)

তারকাগুলো যে স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সে স্থান হল ব্লাক-হোল, সকল বিজ্ঞান ও অজানাকে জানার উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআনুল কারীম। বিজ্ঞানের সাথে কোরআনুল কারীমের কোন দ্বন্দ্ব নেই, যদি কোথাও বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের মতানৈক্য ঘটে তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোরআনের কাছ থেকে। কারণ কোরআন হচ্ছে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, অজানাকে জানা ও কল্যাণের উৎস।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উপস্থাপিত প্রায় প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই 'শপথের' আকারে অবতীর্ণ করেছেন। এটা সম্ভবতঃ গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণেই হয়ে থাকবে। বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো বিজ্ঞান যদি সত্যি সত্যিই কোনো সঠিক বিষয় উদ্‌ঘাটনে সফলতা লাভ করে থাকে তাহলে তা ঐ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের বাণীকেই বেশী ফুটিয়ে তুলবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً، وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ–

তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভা বর্ধনের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা এখন পর্যন্ত কিছুই অবগত নও। (সূরা নাহল- ৮)

মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোথায় কোন্ বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, কার কি কাজ বা কার কি পরিণতি তার সরাসরি কোনো জ্ঞান পূর্ব হতেই বিজ্ঞানের ছিল না। বিজ্ঞান তার চলার পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে যখন

www.pathagar.com

যতটুকু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে কেবল ততটুকুই বলতে পারে; এর বাইরে বিজ্ঞান পুরোপুরি অন্ধ। এমনকি কোনো বস্তু কখন আবিষ্কার হবে তাও বিজ্ঞান জানে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ–

(হে রাসূল!) বলে দিন! আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন উত্থিত হবে। (সূরা নামল-৬৫)

পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণীসম্ভার তা এ গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পরবর্তী সময়ে বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। বর্তমান বিশ্বে একমাত্র কোরআনই এমন এক অদ্বিতীয় অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ হিসেবে মানব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে যা কুদরতী বাণী এবং একক অনন্যের অধিকারী বলে প্রমাণিত।

কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন, তাহলো বর্তমান যুগকে অত্যাধুনিক যুগ বলে দাবি করা হয়। বিজ্ঞান দিয়েই সকল কিছুর সত্যতা নির্ধারণ করা হয়। যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবে তাকেই একমাত্র ও চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করার এক অযৌক্তিক মানসিকতা জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব এই কোরআনই হলো বিজ্ঞানের মূল উৎস। বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কারের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞানকে কোরআনের কাছেই ধর্ণা দিতে হবে। কোরআন যে কথা প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করেছে বিজ্ঞান সে কথাই নতুন করে পৃথিবীবাসীকে শোনাচ্ছে। বিজ্ঞান বলছে, জগৎ একটি নয় অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। অথচ বহুমাত্রিক জগতের ধারণা আল্লাহর কোরআন বহুপূর্বেই পৃথিবীবাসীকে দিয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি এবং ব্লাকহোল ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন পূর্বে ধারণা দিয়েছে, পৃথিবী ব্যতিতও অন্য কোথাও প্রাণের উৎস থাকতে পারে এ ধারণা আল্লাহর কোরআন বহুপূর্বেই দিয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং, আল্লাহর কোরআনের সত্যতা বিজ্ঞান প্রমাণ করবে না, বিজ্ঞানের সত্যতাই আল্লাহর কোরআন প্রমাণ করবে। একটি মাত্র কোষ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আলো, তাপ, বাতাস ব্যতিত উদ্ভিদ বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে না, ফুলের পরাগায়ন পদ্ধতি, মৌমাছীর কলা-কৌশল, পিঁপড়ার গতি-প্রকৃতি, মরুজাহাজ উটের পানি ও অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ সাধন, সৃষ্টির সমতা, প্রতিটি গ্রহের আবর্তন-বিবর্তন, যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান স্বল্প কিছুদিন পূর্বে ধারণা পেশ করেছে। আর এসব তথ্য আল্লাহর কোরআন সপ্তম শতাব্দীতেই মানুষকে অবহিত করেছে এবং এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বৃদ্ধি লাভ করবে ততই বিজ্ঞান কোরআনের কাছে ঋণের জালে বন্দী হবে। পবিত্র কোরআন থেকে মানব সভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর বিষয়সমূহ আবিষ্কারের জন্য সূত্র লাভ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ–

এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? (সূরা আননিসা-৮২)

বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল

পৃথিবীর কোনো বৈজ্ঞানিকের ক্ষমতা নেই তারা নিজস্ব শক্তি প্রয়োগে আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর সহযোগিতা ব্যতীত ভিন্ন কিছু সৃষ্টি করে প্রশংসা লাভের অধিকারী হতে পারে। তারা যা কিছুই করতে অগ্রসর হবেন, প্রতি মুহূর্তে–প্রতি পদক্ষেপে তাকে মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী হতেই হবে। এ জন্য আল্লাহ ব্যতিত যেমন দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নেই, তেমনি তাঁর প্রশংসা ব্যতিত আর কেউ প্রশংসার হকদারও নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ، لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُوْلٰى وَالاٰخِرَةِ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ব্যতিত দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নন। তাঁরই জন্য প্রশংসা পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে। (সূরা কাসাস)

একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা নিজেদেরকে প্রকৃতি প্রেমিক বলে পরিচয় দিয়ে

www.pathagar.com

থাকে। এরা বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে তার গুণ বর্ণনা করে থাকে। রাতের নির্জনতায় কৌমুদী স্নাত পুষ্প উদ্যানে সুধাকরের স্নিগ্ধ সৌরভে মন-প্রাণ আমোদিত হয়ে ওঠে, সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষ আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে চাঁদকেই সকল সৌন্দর্যের আধার মনে করে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে থাকে। প্রখর সূর্য কিরণে পথ-প্রান্তর যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, উদ্ভিদরাজি শ্যামলিমা হারিয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে, নির্জীব ভূমি ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়, প্রচন্ড দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, তখন হঠাৎ করেই আকাশ থেকে এক পশলা বৃষ্টি যদি নেমে আসে তখন অজ্ঞ মানুষ আল্লাহর প্রশংসা না করে বৃষ্টির প্রশংসা করতে থাকে। মায়াবী চাঁদের আলো নিয়ে প্রশংসামূলক অসংখ্য পংক্তি মালা রচনা করে। মেঘমালা আর প্রশান্তিদায়ক বৃষ্টির প্রশংসায় কবিতা রচনা করে থাকে। কিন্তু এদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এই চাঁদের আলোর স্রষ্টা কে? এই বৃষ্টি কে বর্ষালেন? এরা তখন বলতে বাধ্য হয়, এসবের পেছনে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টা আছেন। এ সকল তথাকথিত প্রকৃতি প্রেমিকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ–

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না। (সূরা আল আনকাবুত–৬৩)

আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য রাশি ও সৃষ্টির নিপুণতা দেখে, তাঁর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর প্রশংসামূলক বাণী উচ্চারিত করলেই হবে না, তাঁর সামনে দাসত্বের মস্তক অবনত করতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ আদায় করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوتِ وَالاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ–

www.pathagar.com

সুতরাং, আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের প্রভাত হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়। (সূরা রুম)

একদিকে মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে, অপরদিকে আল্লাহর কোরআন আবিষ্কারের যে সকল সূত্র দিয়েছে, তা নিয়ে মানব কল্যাণে গবেষণা করতে হবে।

পৃথিবীতে চিন্তা-গবেষণা, পরীক্ষ-নিরীক্ষা এবং অনুশীলনের জন্যে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন, তার সবকিছুই মহান আল্লাহ প্রদত্ত। তাঁর সৃষ্টি বস্তু ব্যতিত কারো পক্ষেই কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কিছু আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব হবে না।

আল কোরআনে পৃথিবীর বর্ণনা

মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছায় আল্লাহ তায়ালা এই সুজলা-সুফলা নয়নাভিরাম পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একে সম্প্রসারিত করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টির আদি ইতিহাস মানুষ জানে না। তবে আদি অবস্থায় এ পৃথিবী যে মানুষ ও জীবজন্তুর বসবাসের উপযোগী ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র হাদীস হতে এ তথ্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ–

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সূরা আ'রাফ-৫৪)

যখন আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তাতে ভীষণভাবে কম্পন উপস্থিত হলো, সূচনাতে পৃথিবী কোনো প্রাণীর অবস্থানের উপযুক্ত ছিল না। আল্লাহ তায়ালা পাহাড়-পর্বতসমূহকে সৃষ্টি করে যমীনের উপর বসিয়ে দেয়ার ফলে কম্পন থেমে গেল এবং শান্ত হয়ে স্বস্থানে স্থিতিশীল হলো। বিচিত্র এ পৃথিবী অপরূপ তার সৌন্দর্য সমাহার। সাগর মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষ-লতা ও নানা আকৃতির এবং নানা ধরনের জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ এ পৃথিবী। কিন্তু বিস্তৃত মরুভূমি, গহীন অরণ্য, সুউচ্চ বরফ আচ্ছাদিত শুভ্র পর্বতচূড়া, সীমাহীন অথৈ জলরাশি, নানা স্বভাবের জীবজন্তু, নানা ধরনের কণ্ঠস্বর ও আকৃতির পাখি, অর্থাৎ মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্রময় এ পৃথিবী মানুষের সকল কল্পনাকে হার মানায়, শিল্পির শিল্পকর্ম স্তব্ধ হয়ে

www.pathagar.com

যায়। এ বিচিত্র পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, গাছ-পালা, পত্র-পল্লব, ফল-মূল, বিশাল সাগর-মহাসাগর, সুউচ্চ পর্বতমালা, উজ্জ্বল তারকা খচিত আকাশ, জ্যোৎস্না রাতের মায়াবিনী রূপ, সকলই যেন আল্লাহ তায়ালাকে চেনার, জানার ও বুঝার জন্য মানব সম্প্রদায়কে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিচ্ছে।

হে মহান স্রষ্টা আল্লাহ! তুমি কত বড় বৈজ্ঞানিক, কত বড় কৌশলী সৃষ্টিকর্তা, কত বড় শিল্পী, কতবড় শক্তির নিয়ন্তা! বৈচিত্র্যপূর্ণ, রহস্যপূর্ণ, মাহাত্ম্যপূর্ণ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত তোমার এ মহান সৃষ্টি! তোমার দরবারে অযুত সিজ্‌দাহ্ নিবেদন করি। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ فِرَاشًاوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ ج فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহ তায়ালার সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। (সূরা বাকারা- ২২))

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের মত নয়। বিজ্ঞানীদের মতে সৃষ্টিজগতের গ্রহ, নক্ষত্রগুলোর জন্ম প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কালক্রমে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলাদা-আলাদা হয়। পৃথিবীর উত্তপ্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে শীতল হয় এবং উষ্ণতা স্বাভাবিক হয় আর ভূ–পৃষ্ঠে নানা প্রকারের পরমাণু দ্বারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ গঠিত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তন বা বিবর্তনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে বায়ু মণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস এবং পানির বাষ্প তৈরী হয়ে বায়ুমণ্ডল গঠিত হয়। অতঃপর উক্ত বাষ্প হতে মেঘ ও বৃষ্টি হয় এবং ভূ–পৃষ্ঠে পানির উদ্ভব হয়।

বিজ্ঞানীদের মতে, ভূ-পৃষ্ঠে জীবের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য সঠিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পরমাণু মিলে যৌগিক অণু গঠিত হয় এবং তা হতেই কালক্রমে সাগরে বা পানিতে জীবের আবির্ভাব ঘটে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীকে সকল প্রকার জীবের তথা মানুষের জন্য উপযোগী করে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الاَرْضَ قَرَارًا–

তিনি যমীনকে স্থিতি ও বসবাসের উপযোগী জায়গা বানিয়েছেন। (সূরা নামল-৬১)

মানুষ ও জীবজন্তুর বসবাসের জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى–

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (সূরা ত্বাহা-৫৩)

মানুষের কল্যাণে জলে, স্থলে, পাহাড়ে, মরুভূমিতে, কঙ্করময় স্থানে, মহাশূন্যে, বনাঞ্চলে চলার পথ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً–

এতে তোমাদের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা ত্বহা)

পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযোগী নানা ধরণের উপকরণের ব্যাপারেও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর নানা ধরণের বস্তু মানুষ কিভাবে নিজ কল্যাণে ব্যবহার করবে, পশুসম্পদ কিভাবে কাজে লাগাবে, শস্য ও ফলমূল কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারেও কোরআন দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবী সৃষ্টি করে এবং মানুষকে এখানে প্রেরণ করে নীরবতা অবলম্বন করেননি। যেখানে মানুষকে প্রেরণ করা হলো, সে স্থান সম্পর্কেও মানুষকে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, যেখানে মানুষ বসবাস করবে সে স্থানটি কি ধরণের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত স্থান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ فِرَاشًاوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ–

www.pathagar.com

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য শয্যা বানালেন, আকাশকে বানালেন ছাদ এবং আকাশ থেকে পানি পাঠালেন, তার সাহায্যে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। (সূরা বাকারা-২২)
এ পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِىْ االارْضِ جَمِيْعًا–

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করেছেন। (সূরা বাকারা-২৯)

পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল ও কোরআন

এ পৃথিবীপৃষ্ঠে মানবজাতির ইতিহাস খুব বেশী পুরনো নয়। তবে অতীতের যে কোনো যুগের তুলনায় বিজ্ঞান সাধনা ও তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান মানব সভ্যতাই সর্বাধিক অগ্রগামী। সৃষ্টিসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করে তা মানব কল্যাণে ব্যবহারের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন–

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا تُغْنِىْ الايٰتُ وَالنُّذُرُ–

(হে রাসূল! আপনি) বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। (সূরা ইউনুস-১০১)

বর্তমান বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, মহাবিশ্বের সকল কিছুই জ্ঞানের সাগরে নিমজ্জিত। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'মহাবিশ্বের অথৈ জ্ঞান সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দু'একটি বালুকণা মাত্র নাড়া-চাড়া করে গেলাম, এর বেশী আর কিছুই করতে পারিনি।' মানুষের জ্ঞানের এই অসহায়ত্বের দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ বলেন–

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ، وَّ اَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ–

www.pathagar.com

তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে এবং এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী। সুতরাং এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে? (সূরা আরাফ)

এই পৃথিবী সৃষ্টির কলাকৌশল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ–

(হে নবী) আপনি বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হামীম সিজ্‌দা-৯)

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ –

তিনিই এ যমীনের মাঝে এর ওপর থেকে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে সবার আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (সূরা হামীম সিজদা-১০)

পৃথিবী সৃষ্টি করে এর মাঝে পাহাড় গেড়ে দিয়ে একে স্থিতিশীল করলেন, এরপর পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি করা হলো তাদের আহারের পরিমাণও নির্দিষ্ট করা হলো।

বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, ঊর্ধ্ব জগতে ছায়াপথ গঠিত হবার পূর্বে ঊর্ধ্ব জগতের ভাসমান বস্তুসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে বাষ্পীয় বস্তুর আকারে বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ ছায়াপথসমূহ গঠিত হবার পূর্বে তা গ্যাসীয় বস্তু হিসেবে বিদ্যমান ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের দেয়া এই তথ্যের প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন একাধিক স্থানে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা করেছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ اءْ تِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا، قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ–

এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা তখন ছিলো ধুম্রকুঞ্জ বিশেষ, এরপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসে- ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি। (সূরা হামীম সিজদা-১১)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ –

অতঃপর তিনি দু'দিনের ভেতর এ (ধুম্রকুঞ্জ)-কে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার উপযোগী আদেশনামা পাঠালেন; পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং সুরক্ষিত করলাম। এসব পরিকল্পনা অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক পূর্ব থেকেই সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছিলো। (সূরা হামীম সেজদা-১২)

আধুনিক বিজ্ঞান 'বিগব্যাঙ' থিউরী উপস্থাপন করেছে, অথচ এর সুত্র নবী করীম (সাঃ) পবিত্র মুখ থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা উচ্চারিত করিয়েছেন সেই সপ্তম শতাব্দীতে।

বিগব্যাঙ এবং বিগক্র্যাঞ্চ থিউরী সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। উক্ত আয়াতে দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা বলতে দু'টি মেয়াদকালকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টির সূচনায় সকল কিছুই যে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিলো এবং সাত আকাশ বলতে কি বুঝায় এ বিষয়টিও আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহ

পৃথিবীর সমগ্র পরিবেশের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মহান আল্লাহর প্রতি সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। লক্ষ্য করে দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সমগ্র সৃষ্টিজগতকে মানুষ বা কোনো জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করেননি। সৃষ্টি জগতের সকল স্থানেই জীবের বসবাসের জন্য তিনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেননি। এর পেছনেও মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অবশ্যই কল্যাণ রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের কোনো গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও তার বিকাশ এবং বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের অনুকুল পরিবেশ একান্তই অপরিহার্য। যে গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হবে সে গ্রহটিতে কতকগুলো মৌলিক পদার্থ যথা কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি থাকবে। এসব পদার্থের পরমাণুগুলো

www.pathagar.com

বিশেষ নিয়মে মিলে মিশে নানা ধরনের অণু গঠন করে। এসব অণু প্রাণী দেহের কোষ (Tissue), হাড় (Bone), ইত্যাদি গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

যে গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে, তাতে পরিমিত পরিমাণে পানি থাকতে হবে। কারণ পানি জীবের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেয়ার উপরই জীবদেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিগর্ত হতে সহায়তা করবে। জীবের বসবাসের উপযোগী গ্রহে বায়ু মন্ডল থাকবে। সমগ্র গ্রহটিকে বায়ুমন্ডল আবৃত করে রাখবে। যেখানে থাকবে পরিমিত পরিমাণে অক্সিজেন এবং জীবন ধারনের উপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্যাসীয় স্তর। কারণ অক্সিজেন জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য। বায়ুমন্ডল প্রাণী জগতের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করবে।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হতে হবে। তাপমাত্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম হলে সে গ্রহটি প্রাণী জগতের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। জীব বসবাসের গ্রহটির বায়ুমন্ডল স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত হতে হবে। যেন সেই বায়ু স্তর ভেদ করে সূর্যের কোনো ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) বা ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে ক্ষতিকর রশ্মি আগমন করতে সক্ষম না হয়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী ব্যতিত সৌরমন্ডলের যতগুলো গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান নেই। কোনো কোনো গ্রহে গ্যাসীয় আবরণ বা বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব নেই। আবার যেগুলোতে রয়েছে তা কোনো প্রাণীর জন্য উপযুক্ত নয়। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে গবেষকগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সৌরমন্ডল ছাড়াও অন্য সৌরমন্ডলেও প্রয়োজনীয় পরিবেশে জীব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরা নিয়মিত গবেষণা করে যাচ্ছেন।

পৃথিবী ব্যতিত অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তা বিজ্ঞানীদের কাছে অনিশ্চিত বা গবেষণার পর্যায়ে থাকলেও পবিত্র কোরআন চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘোষণা করেছে–

وَمِنْ ايتِه خَلْقُ السَّموتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ–

এই আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এবং এ দুই জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন। (সূরা শূরা-২৯)

www.pathagar.com

পৃথিবীর বাইরে মানুষের ন্যায় কোনো প্রাণী রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে কোরআনের বর্ণনানুযায়ী প্রাণের অস্তিত্ব যে রয়েছে, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

পৃথিবীর আকৃতি কেমন

এই পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন শতাব্দীদে চিন্তাবিদগণ নানা ধরনের মতামত পেশ করেছেন। অনেকে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতেও এ ভয়ে দ্বিধাবোধ করতেন যে, যদি তারা পৃথিবীর প্রান্তে উপনীত হয়ে নীচে কোনো অন্ধকার বিবরে নিক্ষিপ্ত হন! অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন ধরণের অমূলক ধারণা পোষণ করতেন। ১৫৯ খৃষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক পানি পথে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভ্রমণ করে তথ্য দেন যে, পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণ গোলাকার নয় বরং এর আকৃতি একটি বড় ধরনের ডিমের অনুরূপ। ইতোপূর্বে অনেকেই মত পোষণ করেছেন, পৃথিবীর আকৃতি সমতল। বিজ্ঞানীগণ গবেষণায় দেখলেন, পৃথিবীর আকৃতি যদি সম্পূর্ণ সমতল হতো, তাহলে রাত এবং দিন চিরাচরিত নিয়মে অর্থাৎ ধীরে ধীরে যেভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তা হতো না। হঠাৎ করেই দিনের স্থানে রাত এবং রাতের স্থানে দিনে আগমন ঘটতো।

পৃথিবী ডিম্বাকৃতির কারণেই রাত এবং দিন ধীরে ধীরে ক্রমশ একে অপরকে আচ্ছাদিত করে। ঠিক এ কথাটিই সপ্তম শতাব্দীতে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে জানিয়ে দিলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ–

তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, কিভাবে তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর আদেশের অধীন করে রাখেন, প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহ আপন কক্ষপথে এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। (সূরা লূকমান- ২৯)

www.pathagar.com

যে প্রক্রিয়ায় দিন এবং রাতের আবর্তন পৃথিবীতে সংঘটিত হচ্ছে, বিজ্ঞানীগণ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে হলে আকৃতি হতে হবে ডিম্বাকৃতি। পরিপূর্ণ গোলাকার বা সমতল হলে এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ، يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ يَّجْرِىْ لاَجَلٍ مُّسَمًّى، اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ-

তিনি আকাশ ও যমীন সুপরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপটে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপটে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার- ৫)

আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমানে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে যে কথা বলছে, বিগত চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করেছে। উট পাখীর ডিমকে আরবী ভাষায় 'দাহাহা' বলা হয়, আর 'দাহা' শব্দের অর্থ হলো, বিছিয়ে দেয়া, ছড়িয়ে দেয়া, বিস্তৃত করা। পৃথিবী সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে-

وَالاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا-

এরপর পৃথিবীকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। (সূরা নাযিয়াত- ৩০)

অর্থাৎ এ পৃথিবীকে তিনি ডিম্বাকৃতিতে বিস্তৃত করেছেন। বিজ্ঞানীগণ অঢেল অর্থ ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষের সম্মুখে এ ধারণা উপস্থাপন করেছেন। অথচ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পৃথিবীর সঠিক আকৃতি কেমন, তা মানব সভ্যতে জানিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর বায়ু মন্ডল

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য এই পৃথিবীকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী হলো প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য একটি অনুপম গ্রহ।

www.pathagar.com

প্রাণের উৎপত্তির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ, উপযুক্ত বায়ুমন্ডল এবং বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও অক্সিজেন, ভূ-পৃষ্ঠে অফুরন্ত পানি এবং সে পানির উষ্ণতা জীবের জন্য স্বাভাবিক করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীর শূণ্যমার্গে বায়ুমন্ডলের ওপর দিয়ে এমন একটি স্তর সৃষ্টি করেছেন, যাকে ওজোন (Ozone) বলা হয়। এই স্তর সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) থেকে প্রাণী জগতকে রক্ষা করে।

পৃথিবী সূর্য থেকে যথাযথ দুরত্বের কক্ষপথে অবস্থান করার কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা প্রাণীকুলের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সঠিক পরিমাণের পদার্থ অর্থাৎ ভর (Mass) সৃষ্টি করেছেন। ফলে সঠিক মাধ্যাকর্ষণ বলবিশিষ্ট হয়েছে এবং এ কারণে বায়ুমন্ডল যথাযথভাবে আকর্ষিত করে ভূপৃষ্ঠের সাথে চেপে রেখেছে যেন প্রাণীকুলের জন্য বায়ুমন্ডল ক্রিয়া করতে পারে। যদি ভর নির্দিষ্ট পরিমাণের কম থাকতো তাহলে বায়ুমন্ডলের প্রয়োজনীয় গ্যাস ও পানির বাষ্প ক্রমশঃ মহাকাশে হারিয়ে যেত এবং পৃথিবীতে কোন বায়ুমন্ডল থাকতো না। ফলে পৃথিবীতে অক্সিজেন এবং পানির অস্তিত্ব থাকতো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ–

হে নবী বলে দিন! তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের কূপের পানি যদি যমীনে তলিয়ে যায়, তাহলে এই পানির প্রবহমান ধারাসমূহ তোমাদেরকে কে বের করে এনে দিবে? (সূরা মুল্ক-৩০)

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ছবি ক্যামেরায় ধারণ করে দেখা গিয়েছে, ছবিতে সবুজ রং বেশী এসেছে। পৃথিবীর পানিপূর্ণ এলাকাগুলোই ছবিতে সবুজ আকারে উদ্ভাসিত হয়েছে। পানির বেশী প্রয়োজন, এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে পানি বেশী দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে সকল জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করে বলেছেন–

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

তিনি যমীনকে স্থিতি ও বসবাসের উপযোগী স্থান হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এ পৃথিবীর ওপরে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং যমীনের ওপরে পাহাড়-পর্বতকে স্তম্ভ হিসেবে গেড়ে দিয়েছেন এবং প্রবহমান নদী-সাগরের দুটো ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নম্ল–৬১)

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবী থেকে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যেন তাদের চাহিদানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَابِهٖ اَزْوَجًامِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى، كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ–

যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ করেছেন এবং এতে তোমাদের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তোমরা আহার করো এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। (সূরা ত্বাহা)

বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প

বিজ্ঞানীদের ধারনা অনুসারে পৃথিবীর মূল আবহাওয়ামন্ডলের বিস্তৃতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু। পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলের ৯৯ শতাংশই এর মধ্যে পড়েছে। তবে ১ হাজার মাইল বা ১ হাজার ৬ শত কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলে গ্যাসের হাল্কা অস্তিত্ব বিরাজমান। পৃথিবীর এই বায়ুমন্ডলের ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, ১ ভাগ আর্গন। এছাড়া রয়েছে কার্বনডাই-অক্সাইড, অন্যান্য গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। বায়ুমন্ডলের এসব উপাদানসমূহ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের টিকে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

প্রাণীর জীবন ধারনের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানব শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় এবং তা মানবদেহের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। আগুন মানুষের জীবন ধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। অক্সিজেন ব্যতিত আগুন প্রজ্জলিত হয় না। কয়লা, তেল বা অন্য কোন দহনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। বায়ূমন্ডলে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাস যে কোনো ধরনের দহন কার্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ-তরু, লতার জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য। বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিদের জন্য প্রাণস্বরূপ। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে আলোকশক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাই- অক্সাইড ও পানির সমন্বয়ে শর্করা (গ্লুকোজ) উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ

www.pathagar.com

করে। অর্থাৎ পানি এবং কার্বনডাই অক্সাইড থেকে সূর্যের আলোতে বৃক্ষ তরুলতার সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার খাদ্য ও অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত হয় এবং অনাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেয়।

এভাবে মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষ, তরু-লতা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে এদের সমতা রক্ষা করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বায়ুমন্ডলকে আদেশ দান করেছেন, যেন বায়ুমন্ডল সমগ্র পৃথিবীকে আবৃত করে রাখে। ফলে দিন ও রাত, গ্রীষ্ম এবং শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য বেশী হতে না দিয়ে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগৎ টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বায়ুমন্ডলে নানা ধরনের স্তর সৃষ্টি করেছেন। এসব স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর একটি স্তরের নাম হলো ওজোন স্তর। এই ওজোন স্তর সূর্য থেকে নির্গত হওয়া ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) শোষণ করে জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগতকে হেফাজত করে। বায়ুমন্ডলের আরেকটি স্তরের নাম হলো Ionsphere। এই স্তর থাকার কারণে মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে আল্লাহর আদেশে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এই জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠার পর ক্রমে তা শীতল হতে থাকে এবং পানি বিন্দু সৃষ্টি হয়। এরপর তা ঘনীভূত হয়ে আল্লাহর আদেশে মেঘমালায় পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে মেঘ দূর-দূরান্তে চলে যায়। তারপর আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সিক্ত করে। এভাবে আল্লাহ মৃত যমীনকে জীবিত করেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا–

তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করে এবং বায়ু দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর তিনি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করেন এবং মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তোলেন। (সূরা ফাতির-৯)

www.pathagar.com

আল কোরআন ও পানিচক্র

পৃথিবীর যেখানে বৃষ্টি প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালা বায়ুকে আদেশ করেন সেখানে মেঘমালা সঞ্চালিত করার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে বায়ু সে আদেশ পালন করে। কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং বৃষ্টির ফোটার আকার কি হবে সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করে দেন। এভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীকে সিক্ত করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه، حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِه مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ–

তিনি নিজের অনুগ্রহের (বৃষ্টি বর্ষণের) প্রথমে বাতাসকে সুসংবাদবাহী হিসেবে প্রেরণ করেন। তারপর যখন সে বাতাস পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে, তখন সে বাতাসকে কোনো মৃত (শুষ্ক) যমীনের দিকে প্রেরণ করেন, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর যমীন থেকে নানা ধরনের ফলমূল উৎপদন করেন। (সূরা আরাফ-৫৭)

পবিত্র কোরআন পানিচক্র সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। আর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্নার্ড প্যালিসি সর্বপ্রথম পানিচক্র সম্পর্কিত ধারণা পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে পেশ করে বলেন, 'পানি সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হয়ে শীতল হয় তারপর তা মেঘে ঘনীভূত হয়। এরপর মেঘমালা স্থলভাবে শূন্যমার্গের বিভিন্ন স্থানে গমন করে এবং সেখানে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে ঝরতে থাকে। এই পানি খাল-বিল, নদী-নালা, হ্রদে জমা হয়ে ধারাবাহিক চক্রাকারে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে যায়।'

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মানুষের ধারণা ছিলো, 'সমুদ্রের ওপরি ভাগের পানি বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে স্থলভাগে তা বৃষ্টির আকারে নেমে আসে।' এ যুগের লোকজন ভূগর্ভস্থিত পানির সন্ধান জানতো না। তারা ধারণা করতো, 'কোনো এক গোপন সুড়ঙ্গের মাধ্যমে পানি সমুদ্রে পতিত হয় এবং এসব সুড়ঙ্গ পথসমূহ সমুদ্রের সাথে যুক্ত রয়েছে।' দার্শনিক প্লেটোর যুগ থেকে এ অবস্থাকে বলা হতো 'টার্টারাস'। ১৮ শতকের বিজ্ঞানী ডেকার্টেও এই মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন। এ্যারিষ্টটলের ধারণানুযায়ী, 'পানি শীতল পর্বত গহ্বরে বা খাদে ঘনীভূত হয়ে মৃত্তিকার তলদেশে হ্রদ বা জলাশয় সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে তা নদী-নালাকে পূর্ণ

www.pathagar.com

করে।' আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, বৃষ্টির পানি মৃত্তিকা স্তরের ফাটল দ্বারা বাহিত হয়ে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যার ফলে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি ভরে ওঠে এবং ভূমিতে সজীবতা সৃষ্টি করে। এরই ফলে চারদিকে সবুজের সমারোহ ঘটে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَه يَنَابِيْعَ فِى الاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِه زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُه ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُه حُطَامًا، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لاُولِى الاَلْبَابِ–

(হে মানুষ!) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি যে, আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, এরপর তিনিই তা যমীনের প্রস্রবণগুলোয় প্রবেশ করান, পরে তিনিই আবার তা দিয়ে যমীন থেকে নানা রঙের ফসল বের করে আনেন, কিছুদিন পরে তা আবার শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের ফসল হিসেবে দেখতে পাও, এরপর তিনিই তাকে আবার খড় কুটায় পরিণত করেন, অবশ্যই এ নিয়মের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্যে বড় রকমের উপদেশ রয়েছে। (সূরা যুমার- ২১)

وَاَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءًا بِقَدَرٍ فَاَسْكَنَّه فِى الاَرْضِ، وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِه لَقٰدِرُوْنَ–

আমিই আকাশ থেকে পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষন করেছি এবং তা প্রয়োজন অনুযায়ী যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আবার এক সময় তা উড়িয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূরা মুমিনুন- ১৮)

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْىِ بِه الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اَنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ–

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, এরপর তা দিয়ে যমীন একবার নির্জীব হয়ে যাবার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্য (আল্লাহকে চেনার) বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম- ২৪)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তা'য়ালার এ ধরনের অগণিত নিদর্শন দেখার পরও যারা নবী করীম (সাঃ) ও কোরআনের প্রতি ঈমান আনে না, ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়না বা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামকে পৃথক রাখতে চায়, তাদেরকেই পবিত্র কোরআনে অন্ধ ও বধির হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহাকাশের মেঘমালা

পানি বাষ্পীভূত হয়ে আবার তার মূল ভান্ডারের দিকে ফিরে যায়। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পানির এ মওজুদ ভান্ডারের বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি কে, যিনি একই সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত করে পানির বিশাল ভান্ডার পৃথিবীর অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন? কোন্ সে প্রতিপালক, যিনি ঐ দুটো গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হতে পারে? অথচ এ দুটো পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে। আর পানি যখন বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে যায় তখন অক্সিজেন ও হাড্রোজেন কেনো পৃথক হয় না? যিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَه ثُمَّ يَجْعَلُه رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِه–

তুমি কি (এও) দেখো না, আল্লাহ (এ) মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুকরোগুলোর সাথে) জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন (পুঞ্জীভূত করেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফোঁটাসমূহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে। (সূরা আন্ নূর–৪৩)

মহান আল্লাহ যদি পানির ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে সকল বিজ্ঞানী একত্রিত হয়েও কি একটি ফোটা পানির ব্যবস্থা করতে পারতো? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَرْسَلْنَاالرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ تَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ، وَمَا اَنْتُمْ لَه بِخٰزِنِيْنَ–

আমিই বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, এরপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি, এরপর আমিই তোমাদের তা পান করতে দেই, তোমরা নিজেরা তো তার এমন

www.pathagar.com

কোনো ভান্ডার জমা করে রাখোনি (যে, সেখান থেকে এসব সরবরাহ আসছে)। (সূরা আল হিজর- ২২)

লক্ষ্য করুন, পবিত্র কোরআন কতই না নিখুঁতভাবে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে পানিচক্রের বর্ণনা দিয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُه فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُه كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِه ج فَاِذَا اَصَابَ بِه مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ–

আল্লাহ হলেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর তা এক সময় মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, এক পর্যায়ে তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকেই চান তাদের ওপরই তা পৌঁছে দেন, তখন তারা এটা দেখে ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়। (সূরা রূম- ৪৮)

উত্তাপের কারণে ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্পাকারে উপরের দিকে উত্থিত হয়ে মহাকাশের শূন্যমার্গে জমা হয়ে তা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। আল্লাহ তা'য়ালা বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ করছেন এভাবে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ–

বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ। (সূরা তারিক-১১)

আল্লাহ তা'য়ালা পানিচক্র সৃষ্টি না করলে ভূপৃষ্ঠে কোনো উদ্ভিদ এবং একটি খাদ্য কণাও সৃষ্টি হতো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه، حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِه الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِه مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ–

তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি বাতাসকে বৃষ্টি ও রহমতের আগাম সুসংবাদবাহী হিসেবে

www.pathagar.com

জনপদের দিকে পাঠান, শেষ পর্যন্ত সে বাতাস পানির ভারী মেঘমালা বহন করে চলতে থাকে, তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, এরপর সে মেঘ থেকেই আমি পানি বর্ষন করি, এরপর তা দিয়ে যমীন থেকে আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি। (সূরা আরাফ- ৫৭)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا الرَّابِيًا–

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন, তারপর (নদী-নালা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, এরপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো। (সূরা আর রা'দ- ১৭)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبرَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ، وَالنَّخْلَ بسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ، رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ–

আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যরাজি সৃষ্টি করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়, (আরো সৃষ্টি করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে, (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে) দান করেছি এবং আমি পানি দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন দান করি। (সূরা ক্বাফ- ৯-১১)

وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا طَهُوْرًا، لِنُحْيِ يَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا–

তিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর আকাশ থেকে (তার মাধ্যমে) বিশুদ্ধ পানি বর্ষন করেন, যেন তা দিয়ে তিনি মৃত ভূখন্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করতে পারেন। (সূরা আল ফোরকান- ৪৮- ৪৯)

www.pathagar.com

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ، اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ، وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ، لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ، وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ، اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ-

তাদের শিক্ষার জন্য আমার কুদরতের একটি নিদর্শন হচ্ছে এই মৃত যমীন, যাকে আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, তা থেকেই তারা নিজ নিজ অংশ ভক্ষণ করে। আমি তাতে আরো সৃষ্টি করি নানা প্রকার খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, উদ্ভাবন করি অসংখ্য নদী-নালার প্রস্রবণ। যাতে করে তারা এর ফলমূল উপভোগ করতে পারে, আসলে এগুলোর কোনোটিই তো তাদের হাতের সৃষ্টি নয়, এরপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না? (সূরা ইয়াছিন- ৩৩- ৩৫)

পৃথিবী যে অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে, এটা কোনো সহজ বিষয় নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। যারা এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন তারা অনুভব করেন যে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণশক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ব্যতিত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পৃথিবী নামক এই ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলন্তাবস্থায় বিদ্যমান। এটি কোনো জিনিসের ওপর ভর করে অবস্থান করছে না। কিন্তু এরপরও এর মধ্যে কোনো কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তাতে সমগ্র পৃথিবী যদি কোনো কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো, তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًاوَّ جَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا-

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দুটো ভান্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নাম্‌ল-৬১)

www.pathagar.com

মহাকাশে অদৃশ্য ছাকনি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমার নাম রাহ্মান। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমরা একটু ভেবে দেখো। আমি তোমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা কিভাবে করেছি। এই পানি তোমাদের জীবন, তোমাদের জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য বস্তুর থেকে পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই পানির স্রষ্টা তোমরা নও–আমিই দয়া করে তোমাদের জন্য সে পানি পরিবেশন করেছি। পৃথিবীর বুকে এই নদী-সমুদ্র, খাল-বিল-হাওড়, বিশালাকারের জলাধার আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি সূর্য সৃষ্টি করে তার ভেতরে তাপ দান করেছি। এমন পরিমাণে তাপ দান করেছি যেন সে তাপে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে মহাশূন্যের দিকে উত্থিত হয়। পানির ভেতরে এই গুণ-বৈশিষ্ট্য আমিই দান করেছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপ লাভ করলেই পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। আমি বাতাস সৃষ্টি করেছি। আমার আদেশে বাতাস সেই বাষ্প কণাগুলো ওপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে জমা করতে থাকে। তারপর আমার আদেশে তা মেঘমালায় পরিণত হয়। আমার আদেশে সেই মেঘ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যে স্থানের জন্য যতটুকু পানির অংশ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, সেখানে ততটুকু পৌঁছে দেয়া হয়। ঊর্ধ্বজগতে আমি এমন শীতলতা সৃষ্টি করেছি যার ফলে পৃথিবী থেকে উত্থিত বাষ্প পুনরায় সেখানে পানিতে রূপান্তরিত হয়। তারপর আমারই আদেশে তা পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

পানির ভেতরে মহান আল্লাহ যে বিশেষত্ব দান করেছেন, তা দেখলে সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। সমুদ্রের পানি একদিকে লবণাক্ত, তারপরে এই মানুষ পানিতে কতকিছুর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। কলকারখানার নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ এই পানির সাথে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে। মলমূত্র, বিষাক্ত দ্রব্য ও অজস্র মৃতদেহ এই পানিতে মিশে যাচ্ছে। পানির নিচে নানা ধরনের অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এভাবে পানি মারাত্মক আকারে দূষিত হয়ে পড়ছে। এই পানি পান করলে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূর্য থেকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাপের মাধ্যমে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে ওপরের দিকে উত্থিত হচ্ছে। মহাশূন্যে আল্লাহ এমন এক অদৃশ্য শক্তিশালী ছাকনি (Filter) নির্মাণ করেছেন যে, পানিতে যত জিনিস মিশ্রিত হয়েছে, তাপের দরুন পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন সব ধরনের মিশ্রিত জিনিস নিচে পড়ে থাকে এবং শুধুমাত্র পানির জলীয় অংশসমূহ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে জমা হতে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ، ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ-

কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা নিত্য পান করো; বলতো পারো, আকাশের মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা বর্ষণ করো না আমি এর বর্ষণকারী? অথচ আমি চাইলে এ সুপেয় পানি লবণাক্ত করে দিতে পারি, এসব বিষয় জানা সত্ত্বেও তোমরা কেনো আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো না। (সূরা ওয়াকিয়াহ্- ৬৮-৭০)

আল্লাহ রাহ্মান, তিনি দয়া করে এ ব্যবস্থা না করলে পানি যখন ওপরের দিকে উত্থিত হতো, তখন সেই পানির মিশ্রিত যাবতীয় বস্তুও উঠে যেতো। এ অবস্থায় পানি হতো দুর্গন্ধময় পানের অযোগ্য। সমুদ্র থেকে যে বাষ্প ওপরের দিকে উঠে যায়, তা লবণাক্ত বৃষ্টির আকারে নেমে এসে পৃথিবীর সকল ভূমিকে লবণাক্ত করে দিতো। ফলে পৃথিবীর ভূমিতে কোনো ফসল হওয়া তো দূরের ব্যাপার, ক্ষুদ্র একটি উদ্ভিদও জন্ম নিত না। মানুষ ও মিষ্টি পানির জীবজগৎ এ পানি পানও করতে সক্ষম হতো না। পানি থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ আর দ্রবণীয়-অদ্রবণীয় বর্জ্য পদার্থ, অগণিত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং লবণ নিষ্কাশনের এই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন।

যিনি পানির এই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন তিনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে তার অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে আপন রাহ্মতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্দেশ্যে করেছেন যে, তার তাঁর প্রিয় সৃষ্টিসমূহের জীবন ও প্রতিপালনের মাধ্যম ও উপায় হয়ে দাঁড়াবে। যেসব সৃষ্টি লবণাক্ত পানিতে জীবিত থাকতে ও লাতিত-পালিত হতে পারে, তিনি সেসব সৃষ্টিকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তারা অত্যন্ত আরামদায়ক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ুমন্ডলে বসবাসের জন্য সৃষ্টি জীবের জীবন ও লালন-পালনের জন্য মিষ্টি পানি ছিল অপরিহার্য। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই তিনি পানির ভেতরে এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, পানি তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় এতে সংমিশ্রিত কোন জিনিসসহ উত্থিত হবে না বরং তা সম্পূর্ণ গন্ধ ও দূষিত বস্তু পরিশোধিত হয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পান ও জীবন ধারনের উপযোগী হয়ে উত্থিত হবে। তিনি রাহ্মান–তাঁর রাহ্মত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

www.pathagar.com

মেঘমালা থেকে বজ্রপাত

মানুষ ক্ষেতে চাষ করে ফসল লাভের আশায় বীজ বপন করে বাড়িতে চলে আসে। কৃষক ক্ষেতে বীজ বপন করে তারপর তার পক্ষে আর মূল বিষয়ে করণীয় কিছুই থাকে না। যে ভূমিতে সে বীজ বপন করলো, এই ভূমি তার সৃষ্টি নয়। ভূমিতে উর্বরা শক্তি ও ফসল উৎপাদনের যোগ্যতা কোন মানুষ দান করেনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ مِنْ ايتِه يُرِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا–

তাঁর নিদর্শনের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ ও তার আলো দেখান ভয় এবং আশার সঞ্চারের মাঝ দিয়ে তা প্রতিভাত হয়। (সূরা রূম-২৪)

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বলছেন, যে ঋতুতে বজ্রপাত অধিকহারে সংঘটিত হয়, সে ঋতুতে ফসলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। কারণ বজ্রপাতের মাধ্যমে ভূমিতে যে নাইট্রোজেন চক্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, এতে করে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। এই নাইট্রোজেনই গাছের প্রাণশক্তি। যেসব মৌল উপাদান খাদ্য সামগ্রীতে সংগৃহীত হয়, সেটা মানুষের চেষ্টার ফসল নয়। জমিতে যে বীজ মানুষ বপন করে, তাকে বিকশিত করা ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতাও মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এই চাষাবাদ ও বীজ বপনকে সবুজ আভায় হিল্লোলিত চারাগাছে পরিপূর্ণ ক্ষেতে পরিণত করার জন্য ভূমির মধ্যে যে কার্যক্রম এবং মাটির ওপরে যে আলো, বাতাস, তাপ, শীতলতা ও মৌসুমী অবস্থার আবর্তন হওয়া প্রয়োজন, তার ভেতরে একটি জিনিসও মানুষের সৃষ্টি নয়। ফসলের ভেতরে দানা সৃষ্টির ব্যাপারেও মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। এগুলো সবই ঐ দয়াময় রাহ্‌মান–আল্লাহই অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের জন্য করে থাকেন। তিনি বলেন–

اَفَرَءَ يْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ، ءَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَه اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ، لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنٰه حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ–

তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, তোমরা যে বীজ বপন করো, তা থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন করো না আমি করি? আমি ইচ্ছা করলে এই ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারতাম। (সূরা আল ওয়াকী'আ-৬৩-৬৫)

www.pathagar.com

পানির দুটো ধারা তথা পানি প্রাচীর

রাব্বুল আলামীন বলেন, নদী-সাগর ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, পানির দুটো ধারা কিভাবে বয়ে চলেছে। একটি ধারা সুমিষ্ট আরেকটি ধারা লবণাক্ত। এই পানির ভেতরে নানা ধরনের মাছ আমি তোমাদের খাদ্য হিসাবে মওজুদ রেখেছি। তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ নানা ধরনের অলঙ্কার প্রস্তুত করার উপাদান রেখেছি।

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ، هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ، وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى، ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

পানির দুটো উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা কণ্ঠনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা সজীব গোস্ত লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্য্যের সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই তোমাদের রব, সার্বভৌমত্বও তাঁরই। (সূরা ফাতির)

আল্লাহ তা'য়ালা এমন রব, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সকল কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। লবণাক্ত পানি পান করার অযোগ্য কিন্তু লোনা পানির ভেতর দিয়ে মানুষ যখন নৌযানে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তখন যদি তার পানির প্রয়োজন হয়, এ জন্য আল্লাহ সাগর-মহাসাগরের ভেতরে অসংখ্য মিষ্টি পানির প্রস্রবণ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীর কোন বড় নদী এসে যেখানে সাগরে মিলিত হয়, সেখানেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি পানির প্রস্রবণ পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও মিষ্টি পানির প্রস্রবণ তার নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম। পারস্য উপসাগরেও মিষ্টি পানির প্রস্রবণ রয়েছে। চারদিকে লবণাক্ত পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর মাঝখানে গোল বৃত্তের মতো মিষ্টি পানির স্রোত ঘুরছে। লবণাক্ত পানির স্রোত এসে মিষ্টি পানির স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে, কিন্তু সে পানি পরস্পর মিলিত হয়ে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে না। রাব্বুল আলামীন এমন এক অদৃশ্য প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে করেছেন, যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيٰنِ–

দুটো সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। এরপরেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা তারা অতিক্রম বা লংঘন করে না। (সূরা রাহ্মান-১৯-২০)

বর্তমানে সমুদ্র বিজ্ঞানীগণ নানা ধরণের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, সুস্বাদু বা মিষ্টি পানি এবং লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভাজক তথা দুর্ভেদ্য পানি প্রাচীর রয়েছে। অথচ নবী করীম (সাঃ) কখনো সমুদ্র ভ্রমণ করেছেন বা সমুদ্র দেখেছেন বলে কেউই প্রমাণ করতে পারবেন না। তাঁর সমগ্র জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ঘটনাও সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু এ প্রমাণ কোথাও নেই যে তিনি মক্কা থেকে মাত্র একশত মাইল দূরে জেদ্দায় এসে সমুদ্র দেখেছেন বা সমুদ্রে ভ্রমণ করেছেন। নদী, সমুদ্র বা বড় ধরনের কোনো জলায়শয় তিনি কখনো দেখেননি। অথচ তাঁর পবিত্র মুখ থেকেই উচ্চারিত হলো মিষ্টি পানি এবং লবণাক্ত পানি তথ্য এবং পানি প্রাচীর সম্পর্কিত নিখুঁত বর্ণনা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর মুখ থেকে উচ্চারিত করিয়েছেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًّ وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

কিংবা তিনি শ্রেষ্ঠ- যিনি যমীনকে সৃষ্টিকুলের বসবাসের উপযোগী করেছেন, আবার তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদী-নালা, যমীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তার মধ্যে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, দুই সাগরের মাঝে মিষ্টি ও লোনা পানির সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নামল-৬১)

www.pathagar.com

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান এ গবেষণার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছে, দু'টি সমুদ্র বা নদীর পানি শুধুমাত্র রংয়ের বৈশিষ্ট্যসহই বিভাজিত হয়নি, উভয়ের তাপমাত্রা, ঘনত্ব, মিষ্টতা বা লবণাক্ততাসহই বিভাজিত হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, দুই সমুদ্রের মাঝে এক অদৃশ্য ক্রমনিম্নগতি সম্পন্ন তীর্যক পানি প্রাচীর যেখানে যেখানে রয়েছে, এ প্রাচীর এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পানি প্রাচীরের এপার ও ওপারে উভয়ের পৃথক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, যেখানে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানি মিলিত হয় অর্থাৎ মোহনা এলাকায়, আর যেখানে দু'টি সমুদ্র মিলিত হয়, এ দুই এলাকার অবস্থা ভিন্ন ধরনের। মোহনা এলাকায় লবণাক্ত পানি থেকে মিষ্টি পানির যে পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাহলো, একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের ঘনত্বের Pycnoclin Zone এর উপস্থিতি। যা অনিয়মিতভাবে দুইটি পানি স্তরকে পৃথক করে রাখে। মিষ্টি ও লবণাক্ত উভয় পানি থেকে আলাদা এক লবণাক্ততা রয়েছে এসব সীমান্ত এলাকার পানি প্রাচীরে। ভূমধ্য সাগর, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে জিব্রাল্টার এবং মিসরের নীলনদ প্রবাহিত হয়ে যেখানে ভূমধ্যসাগরের মিলিত হয়েছে, এসব স্থানে উক্ত অবস্থা দেখা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا–

তিনি একই জায়গায় দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন, একটি হচ্ছে মিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও ক্ষারবিশিষ্ট, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা বানিয়ে রেখেছেন, সত্যিই এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা আল ফুরকান-৫৩)

পানির তলদেশ, আল কোরআন ও বিজ্ঞান

সাগর, মহাসাগর তথা সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান অনুসন্ধান চালিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে, সমুদ্রের নীচে গভীর অন্ধকার এবং এ অন্ধকার কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সমুদ্রের বিশ থেকে ত্রিশ মিটার নীচে কোনো উপকরণ ব্যতিত ডুবুরীদের পক্ষে ডুব দেয়া যেমন অসম্ভব তেমনি গভীর সমুদ্রে দুই শত মিটার নীচে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞান জানাচ্ছে- লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনী ও বেগুনী নীল, এই সাতটি রঙের মিশ্রণে একটি আলোক রশ্মি গঠিত হয়।

www.pathagar.com

যে স্থানের পানিকে এই আলোক রশ্মি উত্তপ্ত করে সেখানেই প্রতিসরণ ঘটে। পানির ওপরের অংশের দশ থেকে পনেরো মিটার অংশ লাল রঙ চুষে নেয়।

ঠিক এ কারণে যদি কোনো মানুষ পানির পঁচিশ মিটার নীচে কোনো কারণবশত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে তার রক্তের লাল রঙ দেখতে পাবে না। কারণ পানির পনেরো থেকে পঁচিশ মিটার নীচে লাল রঙ পৌছতে পারে না। আবার পানির ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মিটার নীচে, এ স্তরে কমলা রঙ চুষে নেয় ফলে এ পর্যন্ত কমলা রঙও পৌছতে পারে না। পানির পঞ্চাশ থেকে একশত মিটার নীচের স্তরে হলুদ রঙ শুষে নেয়। এক বা দুইশত মিটার নীচে সবুজ রঙ চুষে নেয়, এরও নীচে বেগুনী রঙ এবং বেগুনী নীল রঙ চুষে নেয়। এভাবে একেকটি স্তরে পৌছলে সকল রঙ যখন চুষে নেয় তখন পানির তলদেশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে ওঠে। পানির এক হাজার মিটার নীচে গভীর অন্ধকার বিরাজ করছে।

বিজ্ঞান বলছে, সূর্যের আলো মেঘ কর্তৃক শোষিত হবার ফলে তা এলোমেলো বিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মিতে পরিণত হয়ে মেঘের নীচে এক ধরনের অন্ধকার সৃষ্টি করে আর এ অন্ধকার হলো অন্ধকারাচ্ছন্নতার প্রাথমিক পর্যায়। আলোক রশ্মিসমূহ যখন সমুদ্রের ওপরের অংশে নিপতিত হয় তখন তা তরঙ্গ বা ঢেউ এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে সমুদ্রের ওপরের অংশকে উজ্জ্বল করে তোলে। ফলে তরঙ্গের মাধ্যমে আলো প্রতিফলিত হবার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। আলোকরশ্মি যখন সমুদ্রের ওপরি ভাগ ভেদ করে কিছুটা গভীরে পৌছে, তখন সমুদ্রে দুই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের ওপরের অংশ তপ্ত এবং আলোকিত হয়ে ওঠে আর গভীরের অংশ ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শুধু তাই নয়, তরঙ্গের কারণে এ সময় সমুদ্রের ওপরের অংশ এবং নীচের অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে, সমুদ্রের অভ্যন্তরের তরঙ্গ বা ঢেউ সমুদ্রের গভীরের পানিকে আবৃত করে রাখে। কারণ সমুদ্রের গভীর পানির কদধডপভণ্র বা ঘনত্ব ওপরের পানির ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশী। সমুদ্রের গভীরে যে অংশে অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে, এর নীচের স্তর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্নতার সূচনা হয়। এর নীচের অংশে যেসব মাছ অবস্থান করে, তারাও নিজেদের দেহের বিচ্যুরিত আলোর সাহায্য ব্যতিত একে অপরকে দেখতে পায় না। সমুদ্রের নীচের এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ববাসীর সম্মুখে বর্তমানে তুলে ধরলেও এর থেকেও নিখুঁত বর্ণনা ও অকাট্য সত্য গত চৌদ্দশত বছর পূর্বে ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) এর মুখ উচ্চারিত হয়েছিলো–

www.pathagar.com

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ، ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا، وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ–

কিংবা একটি অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, এরপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে আরো অন্ধকার করে দিলো, তার ওপর আরো একটি ঢেউ এলো, তার ওপর ছেয়ে গেলো কিছু ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের ওপর এলো আরেক অন্ধকার, যদি কেউ এ অবস্থায় তার হাত বের করে, অন্ধকারের কারণে তার তা দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। (সূরা নূর-৪০)

সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা যেমন তাঁর বান্দাদের সাবধান করেছেন, তেমনি মরুভূমির মরীচিকা সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান মানুষকে ধারণা দিলেও সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে মরীচিকার ব্যাপারে সাবধান করে বলেছেন–

كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً، حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا–

যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা, পিপাসার্ত মানুষ দূর থেকে তাকে পানি বলে মনে করলো, পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির মতো কিছুই পেলো না। (সূরা নূর- ৩৯)

পানি থেকেই জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব

এই পৃথিবীতে মানুষ এমন অনেক কিছু ভোগ করে, চোখে দেখে এবং জ্ঞানে ধরা পড়ে এসব হলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রকাশ্য নেয়ামত। আর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না এবং অনুভবও করতে পারে না সেগুলো হলো আল্লাহ তা'য়ালার গোপন নেয়ামত। স্বয়ং মানুষের নিজের দেহে এমন অনেক কিছু কাজ করে যাচ্ছে এবং দেহের বাইরে পৃথিবীর পরিবেশে মানুষের স্বার্থে কল্যাণময় ভূমিকা পালন করছে এমন অগণিত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু মানুষ এসব সম্পর্কে জানেও না যে, মহান আল্লাহ তাকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য, তার প্রতিদিনের আহারের জন্য, তার দেহের জীব কোষ বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের জন্য এবং তার

www.pathagar.com

অন্যান্য কল্যাণ্যের জন্য নানা ধরনের উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই মানুষের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার এমন অগণিত নেয়ামত স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হচ্ছে যে, এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষের পূর্ব ধারণাও ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মানুষ আল্লাহর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, সেগুলো ঐসব নেয়ামতের তুলনায় অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যেসব নেয়ামত বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষের জ্ঞানের অগোচরে রয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রথমে জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। অথচ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে পৃথিবীবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, 'পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে পানি থেকে।' অথচ তিনি কখনো বিজ্ঞান গবেষণাগারে গবেষণা করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা সেই মহামানবের মুখ দিয়েই উচ্চারিত করালেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ–

আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০)

আধুনিক বিজ্ঞান অতি সম্প্রতি কোষের মূল অংশ সম্পর্কে জানতে পেরেছে, যার আশি ভাগই পানি দিয়ে গঠিত। কোষের এই মুল অংশকে বলা হয় 'সাইটোপ্লাজম।' আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, অধিকাংশ প্রাণী দেহই পঞ্চাশ থেকে নব্বুই ভাগ পানি দিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি সজীব বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে পানি অপরিহার্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ–

আল্লাহ তা'য়ালা বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূর- ৪৫)

জীবন্ত বস্তু বলতে শুধু মানুষকেই বুঝানো হয় না। সৃষ্ট জগতের অসংখ্য জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদসমূহও জীবন্ত বস্তুর মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রজননের মাধ্যমেও জীবের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রেও পানি অপরিহার্য। জীব কোষের পদার্থসমূহের অধিকাংশই পানি এবং অতি সামান্য অংশ রয়েছে অন্যান্য পদার্থ। পানি ব্যতিত জীব কোষ জীবিত থাকতে পারে না এবং কোনো ধরনের জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। আর আয়তনের দিক থেকে পৃথিবী হলো পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার। এই দুরত্বকে জ্যোতির্বিদ্যার একক বা এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (Astronomical unit) বলে। এই হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১ জ্যোতির্বিদ্যা একক। পৃথিবীর ব্যস ১২ হাজার ৭ শত ৫৬ দশমিক ৩ কিলোমিটার। আর ভর ৬. ৬ সেক্সটিলিয়ন। পৃথিবীর গতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবী এক পাক সম্পন্ন করে। যাকে আমরা একদিন বলে থাকি। আর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে আমাদের এই পৃথিবী সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট, ৯ দশমিক ৫৪ সেকেন্ড।

এই পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর এক মেরু থেকে আরেক মেরুর দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। আর বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। পৃথিবী পৃষ্ঠের আয়তন সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১ হাজার বর্গমাইল বা ৫১ কোটি ১ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীর মধ্যে ভূ-ভাগ হলো মাত্র ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৯ হাজার মাইল বা ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তনের মোট এক এর ৩ শতাংশই হলো পানি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি করেছেন পানি থেকে। পৃথিবীতে জীব টিকে থাকা ও বিকাশের জন্যও পানি একান্তই প্রয়োজন। পৃথিবীতে পানির অংশের আয়তন হলো ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল বা ৩৬ কোটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। কত পানি যে আল্লাহ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা কল্পনাও করা যায় না। জীবন ধারনের জন্য পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য নদী-নালা, ডোবা-পুকুর, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এরপরেও আল্লাহ তা'য়ালা মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এসব কিছুই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে যত সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গভীর এলাকার নাম হলো ম্যারিনা ট্রেঞ্চ। গুয়ামের দক্ষিণ পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে এই এলাকাটির গভীরতা ৩৬ হাজার ১৯৮ ফুট বা ১১ হাজার ৩৩ মিটার। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোর গড় গভীরতা ১২ হাজার ৪ শত ৫০ ফুট বা

www.pathagar.com

৩ হাজার ৭ শত ৯৫ মিটার। এই পরিমাপের কম বা বেশী হলেই পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হবে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানির পরিমাপ এই পৃথিবীতে ঠিক রেখেছেন। এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে যিনি সম্পাদন করেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে লিবিয়ার আল আজিজিয়ায় ১৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এ্যান্টার্টিকার ভোকষ্ট–এ মাইনাস ১২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ মাইনাস ৮৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আল্লাহ তা'য়ালা এই তাপমাত্রার ব্যতিক্রম করে দিলেই পৃথিবীর প্রাণীকুল বিপন্ন হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই, আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ব্যতিত পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করতে পারে।

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য বিচিত্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর চলার ধরণ ও গতি এক রকম নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ–فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

আল্লাহ সকল জীবকে পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তাদের কোনটি বুকের ওপরে ভর করে চলে। কোনটি দু'পায়ে ভর করে চলে। আবার কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, তিনি তো সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আন্ নূর-৪৫)

মাটির মৌলিক উপাদান

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছেন, দূর-দূরান্তে মানুষ যেন গমন করতে পারে, সে জন্য নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ভূ-ভাগকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠন করেছেন। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ হলো অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালূমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২

www.pathagar.com

দশমিক ৬ শতাংশ পটাসিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ। এখানে মানুষ যেন তার প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তিনি অনুর্বর যমীনকে উর্বর করেছেন, যেন মানুষ ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়। যমীনে নানা ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেছেন যেন নিরামিষাশী প্রাণীকুল এসব আহার করে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। মানুষকে বলা হয়েছে এসব আহার করো আর আমারই দাসত্ব করো। আমিই তোমাদের রব এবং শুধু আমারই প্রশংসা করো। আমার আইন ব্যতিত অন্য কারো আইন-বিধান অনুসরণ করো না। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, কিভাবে আমি এই পৃথিবীর যমীনকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর করে দিয়েছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَه بِرَازِقِيْنَ–

যমীনকে আমি বিস্তৃত করে দিয়েছি এবং যমীনের ওপর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছি, প্রত্যেক বস্তু আমি সুপরিমিতভাবে (Balanced) সৃষ্টি করেছি এবং এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমাদের জন্য আর সেই অসংখ্য সৃষ্টির জন্য যাদের রিয্কদাতা তোমরা নও। (সূরা হিজর-১৯-২০)

মাটি চারটি পর্বে বিভক্ত

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এ পৃথিবী প্রধানত চারটি পর্বে বিভক্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরের পর্বকে ইনার কোর (Inner Core) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ইনার কোর (Inner Core) কঠিন লোহা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইনার কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। (Outer Core) আউটার কোর (Inner Core) ইনার কোরকে আবৃত করে রেখেছে। এই আউটার কোর তরল লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর সাথে ২০ ভাগ মত নিকেল রয়েছে। এই আউটার কোরের পুরুত্ব (Thickness) প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। এই আউটার কোরের ওপরের পর্বকে ম্যান্টেল (Mantle) নামে অভিহিত করা হয়েছে। ম্যান্টেল

www.pathagar.com

(Mantle) প্রধানত অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহার তৈরী যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই ম্যান্টেলের পুরুত্ব প্রায় ২৯২০ কিলোমিটার।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ম্যান্টেল কোরের ওপরের স্তরকে ক্রাষ্ট (Crust) বলা হয়। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এই ক্রাষ্টের ওপরেই অবস্থান করছে। এই ক্রাষ্টের পুরুত্ব প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে প্রায় ১০ কিলোমিটার। ম্যান্টেলের ওপর অংশের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত একটু ভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন। ক্রাষ্ট এবং ম্যান্টেলের ওপরের অংশের এই এলাকা সম্মিলিতভাবে লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) প্রস্তুত করে। লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গঠিত এবং সাতটি বিরাটাকারের খন্ডে বিভক্ত। এগুলোকে কন্টিনেন্টাল প্লেটস (Continental Plates) নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার লিথোস্ফিয়ারের নিচের অংশকে এ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা ৪০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং যতই ওপরের দিকে আসা যাবে ততই এর তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের ওপরের অংশের এই তাপমাত্রা .০৬ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে এবং তা পৃথিবীর ভেতর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার সময় এ্যাসথেনোস্ফিয়ারে কনভেকশন কারেন্ট (Convection Current) প্রস্তুত করে।

এই কারেন্ট বা স্রোত যমীনের ওপরের অংশে ধাক্কা দেয় এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ্যাসথেনোস্ফিয়ারের এই কনভেকশন কারেন্টের কারণে কন্টিনেন্টাল প্লেটগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ এই সাতটি প্লেটের ওপরে অবস্থিত, এ কারণে মহাদেশগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। এই প্লেটগুলো যখন চলতে থাকে তখন এর কিনারাগুলো একটির সাথে আরেকটি ক্রিয়া করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ক্রিয়া চার ধরণের হতে পারে। যখন একটি প্লেট আরেকটি প্লেটকে ধাক্কা দেয় এবং একটি অন্যটির নীচে চলে যেতে পারে না, যে এলাকায় এটা ঘটে সে এলাকাকে কলিসন জোন (Collision Zone) বলে। এলাকায় প্লেটের কিনারা বাঁকা হয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, হিমালয় পর্বত এই প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন একটি প্লেট অন্য প্লেটের নীচে চলে যায় তখন ভূমিকম্প হতে পারে, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি উদগীরণ হতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা দ্বারা পর্বতমালার সৃষ্টি হতে পারে যেমন হয়েছে আন্দিজ পর্বতমালা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য।

www.pathagar.com

মাটি নিয়ন্ত্রণসাধ্য

মানুষের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপকরণ দিয়েই এই ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহ তা'য়ালা গঠন করেছেন যেন মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই সংগ্রহ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ–

তিনি তোমাদের জন্য মাটিকে পরিচালনসাধ্য বা নিয়ন্ত্রণসাধ্য (Manageable) করে দিয়েছেন। তোমরা মাটির বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো। (সূরা মুল্‌ক–১৫)

আল্লাহ তা'য়ালা এই মাটিকে পাথরের মতো কঠিন করেননি, আবার পানির মতো তরলও করেননি। যেরূপে যে অবস্থায় মাটি থাকলে সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ হয়, আল্লাহ তাই করেছেন। আর যিনি এটা করেছেন তাকেই বলা হয় রব্। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ، اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

আর তিনিই ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন। এসব কিছুর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রা'দ-৩)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন'। এ আয়াতে যে 'মাদ্দা' শব্দ ব্যহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো, 'কোন কিছুকে টানা বা বিস্তৃত করা।' বিজ্ঞানীদের পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ এলাকা অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার পরও অতিরিক্ত চাপের (Pressure) কারণে কঠিন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের অল্প গভীরে চাপের পরিমাণ কম থাকার কারণে মাটির নিচের পদার্থসমূহ গলিত অথবা কঠিন বা মিশ্রণ

www.pathagar.com

অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভূ-পৃষ্ঠ ঠান্ডা হওয়ার জন্য কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ঢাকনা (Crust) বা আবরণের সৃষ্টি হয়েছে। মাটির এই আবরণ পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়নি। আবরণটি গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে বা আবৃত করে রেখেছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই আবরণ গঠিত না হলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না।

ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত প্রাণী জগতের কল্যাণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ সৃষ্টি করে টেনে দিয়েছেন বা বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই আবরণের বিষয়টি এতটা সহজ নয়। চিন্তা গবেষণা করলে মাটির এই আবরণটির গঠনের কলা-কৌশল দেখলে সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। যমীনকে আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন–

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ–

এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, দেখতো আমি কত চমৎকার করে বিছিয়েছি! (সূরা যারিয়াত-৪৮)

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ–

আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তারপর এর ওপরে পাহার গেঢ়ে দিয়েছি, তারপর যমীনের ওপরে নব ধরনের উদ্ভিদ দান করেছি এবং এসব উদ্ভিদ যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই দান করেছি। (সূরা হিজর–১৯)

গোলাকার উত্তপ্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিয়ে বা বিস্তৃত করে দিয়ে যথাযথ উষ্ণতা, পানি, বায়ূ ইত্যাদি সৃষ্টি করে আল্লাহ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের মাটির ভেতরে আল্লাহ স্তর সৃষ্টি করেছেন বা বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً–

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন। (সূরা বাকারাহ্-২২)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

www.pathagar.com

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ مَهْدًا–

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা করেছেন। (সূরা ত্বাহা-৫৩)

اَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ مِهدًا–

মাটিকে তোমাদের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছি, তা কি তোমরা দেখতে পাও না? (সূরা নাবা)

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে

আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। কোন একটি ধূলি কণাও যেন শুষ্ক না থাকে মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থা করেন। গাছ ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে–এ জন্য প্রয়োজন হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি। আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন–তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন। বৃক্ষ-তরুলতা বায়ুমন্ডলে থাকা কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে, বায়ুমন্ডল মাটি ও পানি থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে এবং বায়ুমন্ডল ও পানি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে। এছাড়াও নানা পদার্থসমূহ মাটি থেকে সংগ্রহ করে।

এই পৃথিবীকে তিনি প্রাণীকুলের জন্য বাসোপযোগী করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই পৃথিবী আকৃতিতে গোলাকার। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ অঞ্চল উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রস্থ এলাকার উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে এসেছে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ শিলা, বালি ও মাটি দিয়ে গঠিত। এই ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মহান আল্লাহ নানা ধরনের খনিজ সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার ওপরের দিকে রয়েছে নদী, সাগর, মহাসাগর এবং বনজসম্পদ। নদী সাগর, মহাসাগরের গর্ভে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য অগণিত সম্পদ দান করেছেন। বনজ সম্পদ শুধু মানুষেরই কল্যাণে আসে না, সমস্ত প্রাণীকুল বনজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে, মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থাও করেছেন।

পৃথিবীর ওপরে শূন্যমার্গে বায়ুমন্ডল দিয়ে আবৃত করা রয়েছে। মাটি, পানি ও বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন বলে এই পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য বসবাসোপযোগী হয়েছে। এই পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ قَرَارًوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ، ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ،

www.pathagar.com

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ-

আল্লাহই তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং ওপরে আকাশের গম্বুজ নির্মাণ করেছেন, যিনি তোমাদের প্রতিকৃতি রচনা করেছেন, অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিয্ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ এসব কাজ যিনি নিপুণভাবে সম্পাদন করেছেন তিনি তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্বলোকের সেই রব।

আল্লাহ তা'য়ালা শুধু এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য শয্যা বানিয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষের জন্য অসংখ্য কল্যাণের পথ সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং সেখানে তোমাদের কল্যাণের জন্য পথ করে দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হও। (সূরা যুখরুফ-৯)

ভূপৃষ্ঠের কম্পন

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ-

তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, তিনি আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করেছেন কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিতই, তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়েছেন এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছেন। (সূরা লুকমান- ১০)

www.pathagar.com

এসব আয়াতে 'কাঁপা' বা 'হেলে' যাওয়া শব্দ দিয়ে আমরা যে মাটির ওপরে অবস্থান করছি সেই মাটিকে বা পৃথিবী পৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এসব আয়াত থেকে গোটা ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন বা আন্দোলিত হবার কথা বুঝানো হয়নি। বরং গোটা পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত না হয়েও ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থান যে কোনো মুহূর্তে আন্দোলিত হতে পারে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর একটি দেশে ভূমিকম্প হলে অন্য দেশ তা অনুভব করতে পারে না। আবার একটি দেশের ভেতরেও একটি বিশেষ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় কিন্তু পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হওয়ার জন্য পৃথিবীর সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপার প্রয়োজন হয় না। ভূমিকম্পের কারণে স্থানীয়ভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হয় এবং সেই কম্পন দূরবর্তী কোন স্থানকে প্রভাবিত নাও করতে পারে- সাধারণত এটা করে না তাই আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি না করতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের এই স্থানীয় কম্পন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করতো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ–

আমি ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে দিয়েছি যেন ভূ-পৃষ্ঠ তাদের নিয়ে কাঁপতে না পারে। (সূরা আম্বিয়া-৩১)

রেল লাইনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইস্পাত নির্মিত পাতগুলোর নিচে রয়েছে অনেকগুলো ইস্পাতের পাত বা মোটা কাঠ। এগুলোর সাথে লোহার মোটা পেরেক দিয়ে রেল লাইনগুলো অত্যন্ত মজবুতভাবে এঁটে দেয়া হয়েছে যেন ট্রেন চলাচলের সময় তা নড়াচড়া করতে না পারে। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বতগুলো পেরেকের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا–

আর পাহাড়গুলো গ্রাফীর ন্যায় গেড়ে দিয়েছি। (সূরা নাবা-৭)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে যত পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয় তারচেয়েও অনেক বেশী মাটির অতলদেশে প্রোথিত রয়েছে। কোন পর্বতমূল ভূ-গর্ভের কতটা গভীরে প্রোথিত রয়েছে তা নির্ভর করে সেই পর্বতটির সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছিল। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির লাভার মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়েছে না অন্য কোনভাবে। গড় হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫

www.pathagar.com

মাইল পর্যন্ত পুরু বা মোটা হতে পারে। এ কারণে পর্বতের মাটির নিচের মূল অংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মাইল গভীরে প্রোথিত থাকতে পারে। এরচেয়ে অধিক গভীরে অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে পদার্থগুলো গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, পাহাড়-পর্বতসমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উত্থিত হয়েছে এবং নিচের দিকেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং পাহাড়-পর্বতগুলো ভূ-পৃষ্ঠে গজালের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যবস্থা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ–

আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে পর্বত প্রোথিত করে দিয়েছেন, জীবিকার সামগ্রী হিসেবে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুর জন্য। (সূরা নাযিয়াত-৩২-৩৩)

আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সঠিক অবস্থান দান করেছেন। পর্বতের এই সঠিক অবস্থিতির কারণে বাতাস তথা মেঘের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণে সহায়ক হয়। পাহাড়-পর্বত থেকে প্রবাহিত নদ-নদীর পানি প্লাবিত হয়ে কৃষি কাজের জন্য মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিলাভ করে। নদ-নদীর পানি নিয়ন্ত্রিত করে দূর-দূরান্তে পানির সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং পানিবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এভাবে নানা ধরনের খাদ্য সামাগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলের আহার যোগাচ্ছে। এগুলো যিনি সম্পাদন করেছেন তাঁর নামই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোরআন ঘোষণা করছে–

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا–

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা ও নদী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রা'দ-৩)

পৃথিবীর সৃষ্টি–দুর্ঘটনার ফসল নয়

নাস্তিকদের ধারণানুযায়ী এ পৃথিবী কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এ পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন একজন মহাবিজ্ঞানী–যাঁর নাম আল্লাহ। তিনি এ পৃথিবীকে পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ–

আমি যমীন ও আকাশমন্ডলকে এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী ঐ মহাশূন্যে যা কিছু রয়েছে, তা মহাসত্য ব্যতিত অন্য কোন ভিত্তির ওপর সৃষ্টি করিনি। (সূরা হিজর)

www.pathagar.com

খেল-তামাসার বিষয়বস্তু করে এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন কিছুই এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لعِبِيْنَ–

আমি এই আকাশ ও যমীন এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, তার কোন কিছুকেই খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। (সূরা আম্বিয়া-১৬)

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّموتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لعِبِيْنَ، مَاخَلَقْنهُمَآ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ اَكْثَرَ هُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

এই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর ভেতরে অবস্থিত জিনিসগুলো খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। এগুলোকে আমি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়। (সূরা দুখান-৩৮-৩৯)

আল্লাহ বলেন, আমি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি এবং অসুন্দর করেও সৃষ্টি করিনি। গোটা পৃথিবীর চারদিকে এবং নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার সৃষ্টির নৈপূন্যতা লক্ষ্য করো–কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি তোমার চোখে পড়বে না। কোরআন চ্যালেঞ্জ করছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَموتٍ طِبَاقًا، مَاتَرى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ، هَلْ تَرى مِنْ فُطُوْرٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ–

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমার মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসংগতি দেখতে পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা মুল্‌কঃ–৩-৪)

www.pathagar.com

পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি

এ কথা আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ অসমান। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি থাকার কারণে এই ভূ-পৃষ্ঠ সমান নয়, অসমান। কিন্তু বিছানা তো অসমান হয় না–তাহলে আল্লাহ এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা বলে কোরআনে কেন উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিছানা বা কার্পেট এ দুটো জিনিস ব্যবহার করা হয় কোন কিছুকে ঢেকে বা আবৃত করার জন্য। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত কঠিন এবং গলিত অবস্থায় রয়েছে। এই উত্তপ্ত গলিত অংশ উপযুক্ত পরিবেশের ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে আল্লাহ ঢেকে দিয়েছেন বা আবৃত করে দিয়েছেন বলেই এই যমীনের ওপরে বসবাস করা সম্ভব হয়েছে। ভোগবহুল জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় উপকরণ বা জিনিস যমীন নামক এই ঢাকনার ওপরে বিদ্যমান। এ কারণেই এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ আকারে খুবই ছোট, এ কারণে তার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে পৃথিবীকে অসমতল দেখতে পায়। আসলে বিশাল এই পৃথিবীর আকারের তুলনায় এই পৃষ্ঠদেশের অসমতলতা অত্যন্ত নগণ্য। ছোট্ট প্রাণী পিঁপড়ার কাছে তার ঘরের মেঝে অসমতল হলেও আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই যে, পিঁপড়ার ঘর সমতল। তেমনি এই বিশাল পৃথিবীও আমাদের কাছে অসমতল বলে মনে হয়।

পৃথিবীর ভূ-বিজ্ঞানীগণ (Geologists) পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে একটি বিরাট সময় পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে বিবর্তন হওয়ার কারণেই এসব পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অধিক সংখ্যক পাহাড়-পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি না করে শ্রেণীবদ্ধভাবে (In ranges) সৃষ্টি করেছেন।

কোন কোন পাহাড়কে ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসঙ্গভাবে দৃষ্টি গোচর হলেও মাটির তলদেশ দিয়ে দূরে-অনেক দূরে অন্য পাহাড়ের সাথে যোগসূত্র থাকতে দেখা যায়। বিজ্ঞানিগণ পাহাড়-পর্বতগুলোর আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে শিলা, বালু ও মাটি প্রভৃতি পরীক্ষা করে এবং অন্যান্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলেছেন, পৃথিবী প্রাথমিক পর্যায়ে ভয়ংকর ধরনের উত্তপ্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে বির্বতনের ফলে কালক্রমে তাপ বিকিরণের কারণে পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের ভিতরের অংশের অতিরিক্ত চাপের কারণে তার কিছু অংশ ওপরের দিকে ভাঁজ হয়ে ফুলে উঠতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়। একটি কমলা লেবু শুকিয়ে গেলে যেমন তার ওপরের বাকলের ওপরে যে ধরনের ভাঁজ সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীগণ বলেন, পৃথিবীর ভিতরের অংশে অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার ফলে সেখানে অস্থিরতা (Unstability) বিরাজ করছে। ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে প্রচন্ড আলোড়ন হচ্ছে। এই আলোড়নের কারণে কখনো কখনো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ বা ওপরের স্তরটি ফেটে যায় এবং সেই ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরের গলিত পদার্থ প্রচন্ড বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। এভাবে গলিত পদার্থগুলো ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে জমা হয়ে কালক্রমে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীগণ আরো বলেন, কোটি কোটি বছরের সময়ের বির্বতনেও ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়ে কিছু সংখ্যক পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ পাহাড়-পর্বতসমূহ এ পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীরে প্রোথিত করেছেন এবং অধিক সংখ্যক পাহাড় পর্বত শ্রেণীবদ্ধভাবে মাটির তলদেশ দিয়ে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ জন্যই ভূ-পৃষ্ঠ স্থিরতা (Stability) লাভ করেছে। ভূপৃষ্ঠের সুস্থিরতার ব্যাপারে পাহাড়-পর্বতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এটা এক সাধারণ সূত্র যে, বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বস্তুটির অণু-পরমাণুগুলোর গতি শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং উত্তপ্ত জিনিসের আলোড়নও বৃদ্ধি লাভ করে।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে, কোন তরল পদার্থ যেমন পানি, উত্তপ্ত করলে পানির ভেতরে অস্থিরতা বা আলোড়ন বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে পানির ওপরের পৃষ্ঠে নানা ধরনের স্রোত বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উত্তাপে পানি ফুটতে থাকে। তেমনিভাবে পৃথিবীর ভেতরের অংশও উত্তপ্ত হওয়ার কারণে গলিত পদার্থগুলোর উত্তপ্ততার জন্য এক প্রচন্ড অস্থির অবস্থায় বিরাজ করছে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত। এই উত্তপ্ত গলিত আলোড়িত পদার্থের ওপরে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ওপরি ভাগ বা মাটির স্তর বিদ্যমান।

এই মাটির সুস্থিরতা আনয়নে পাহাড়-পর্বত ভূমিকা পালন করছে। পাহাড়-পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রোথিত থাকায় এবং বিস্তীর্ণ আয়তন জুড়ে মাটির নিচে পরস্পর সংযুক্ত থাকায় এই পৃথিবী পৃষ্ঠ স্থিরতা লাভ করেছে। পাহাড় পর্বতগুলো মাটির নিচ দিয়ে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত রয়েছে অর্থাৎ টানাটানি অবস্থায় আল্লাহ রেখেছেন। এটা এ জন্য রেখেছেন যেন পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথাও সহজে ফাটল ধরে প্রাণী জগৎ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। পাহাড়গুলো একটির সাথে আরেকটি বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। পাহাড়গুলোকে আল্লাহ যদি এভাবে না রাখতেন, তাহলে পৃথিবীর এই ভূ-পৃষ্ঠ কখনও সুস্থির হতো না এবং এখানে মানুষ বসবাস

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَلْقٰى فِى الاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ–

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তোমাদের নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপতে না পারে। (সূরা নাহ্‌ল-১৫)

আল কোরআন, মহাকাশ ও সাধারণ বিজ্ঞান

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ، هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ، بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ–

তিনি (আল্লাহ) মহাকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন কোন রকম স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনিই (আল্লাহ) পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রকার উত্তম জোড়া উৎপাদন করেন। এ আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে। (সূরা লুকমান)

আল্লাহ তায়ালা এই বিশাল আকাশটি সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই। একটি প্যান্ডেল তৈরি করতে হলে শত শত খুঁটির প্রয়োজন দেখা দেয়; কিন্তু এই বিশাল আকাশটি খুঁটি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন।

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا–

সূরা লুকমানের এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো যে, কোন স্তম্ভ ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা আকাশটাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন স্তম্ভ আছে, যা তোমরা দেখতে পাওনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু বর্তমান যুগের পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্রবিশ্ব, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এগুলোর একটি থেকে আরেকটি যেন ছিটকে না পড়ে সে জন্য একটি পদ্ধতি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা স্তম্ভ ছাড়াই কুদরতের ওপর রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যেন একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। (সূরা ফাত্বির-৪১)

এ পৃথিবী থেকে সূর্য অনেক বড়। সে সূর্যের চেয়ে তারকাগুলো আরো বড়। আবার তারকাগুলোর চেয়ে ছায়াপথ আরো অনেক বড়। এই বিশাল বিশাল গ্রহ-উপগ্রহগুলো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে একটিকে আরেকটির সাথে আটকিয়ে রেখেছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্মের অন্তত হাজার বছর পূর্বে নবী করীম (সাঃ), যিনি কোন বিজ্ঞানাগারে লেখাপড়া করেননি, রিসার্চ করেননি, তাঁর মুখ থেকে মধ্যাকর্ষণের কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন।

এই মধ্যাকর্ষণ দিয়েই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, সৌররাজি একটির সাথে আরেকটিকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না যায়। আল্লাহ তায়ালা মহাশূন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে যদি সূর্যের কথাই বলা যায়, তাহলে সূর্য এত বিশাল যে, পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এ রকমের তিন কোটি সূর্যকে খেয়ে হজম করতে পারবে এমন আরো রয়েছে গ্যালাক্সির ভেতরে একটি দুটি নয়, হাজার হাজার সূর্য। এই সূর্য হচ্ছে সে সূর্য যা পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য আজ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠী যত শক্তি ব্যয় করছে, সূর্য তার চারদিকে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সে পরিমাণ শক্তি খরচ করছে। শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়। এগুলো প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতো, তবে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে– কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যেন সৃষ্টিজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

www.pathagar.com

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ-

আমিই তোমাদের ওপর এ সাত আকাশ বানিয়েছি এবং আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন নই। (সূরা মুমিনুন- ১৭)

এ পৃথিবীতে চন্দ্র এবং সূর্যকে পরিমাপ অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা রেখেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছে সূর্য যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এর থেকে যদি কয়েক ডিগ্রী ওপরে উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী বরফে পরিণত হয়ে যাবে। সমস্ত প্রাণীজগৎ বরফ হয়ে যাবে। আর যদি কয়েক ডিগ্রী নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

চাঁদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে যদি কিছু অংশ ওপরে উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যাবে। আবার যদি কিছু অংশ নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী পানিতে তলিয়ে যাবে।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ -

এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি। (আল কোরআন)

সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি যেন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্য ওজোন স্তরে লেয়ার দিয়েছেন। এই লেয়ার আছে বলেই আলট্রাভায়োলেট-রে পৃথিবীর মাটিতে পৌছতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা গোটা সৃষ্টি জগতকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু ওজোন স্তরে ফাটল ধরেছে। কারণ হচ্ছে আমরা পরিবেশ দূষিত করেছি, পাহাড়গুলো কেটে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমি পাহাড়গুলোকে গেড়ে দিয়েছি যেন যমীন নড়া-চড়া করতে না পারে। আর মানুষ পাহাড় গাছ-গাছালি কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ সে পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে না। রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেছেন, গাছ লাগালে সদকার মত সওয়াব মিলে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ-

তোমাদের ওপরে যত বিপদ আসে সমস্ত বিপদ তোমাদের দু'হাতের উপার্জন করা, তোমরা যা উপার্জন করো সেটাই তোমাদের কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন, গাছ কাটাতো দূরের কথা, গাছের পাতাটিও ছিঁড়বে না। প্রয়োজনে গাছ কাটতে পার বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতাটিও ছিঁড়বে না। কারণ গাছের পাতাগুলো আল্লাহ্‌র তাসবীহ পড়ছে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

www.pathagar.com

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-

আকাশে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করছে। (আল কোরআন)

গাছ হলো মানুষের প্রাণ। গাছ অক্সিজেন ছাড়ে আর আমরা সে অক্সিজেন গ্রহণ করি। আর আমরা যেটা ছাড়ি সেটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিয়ে গোটা পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছি। দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানী বা সরকার নেই যে, এ দূষিত কাবর্ন ডাইঅক্সাইডকে রিফাইন করে দূষণ মুক্ত করবে। গাছগুলোকে আল্লাহ তায়ালা এমন বন্ধু বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জন্য যেটা বিষ গাছের জন্য সেটা খাদ্য। আমরা গাছ হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে আমাদের বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেই, গাছ ঐ বিষাক্ত অক্সিজেনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। গাছের পাতার সবুজ রং আর সূর্যের তাপ দুটি মিলে এক প্রকারের রন্ধন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গাছ ঐ কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেন তৈরি করে ছেড়ে দিচ্ছে। এগুলোকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে গোটা মানব জাতির কল্যাণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ-

তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও।

বিজ্ঞানীরা কয়েকটি জিনিস একত্র করে একটি জিনিস তৈরি করেছেন। কিন্তু মূল জিনিস হল আল্লাহ তায়ালার। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়েও একটি চাল বা একটি মুরগীর ডিম বানাতে পারবে না। বিজ্ঞানীরা যা কিছু তৈরি করে তার পেছনে মহান আল্লাহর তৈরি করা জিনিস না হলে বানাতে পারবে না। তওহীদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাঁর নিজের সৃষ্টির উপমা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اللّٰهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ-

তিনি বান্দার ওপরে কখনো জুলুম করেন না। তিনি মানুষের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

www.pathagar.com

مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا-

কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও যমীন? কে আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন? অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন? তাঁর বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এ সকল কাজে আল্লাহ তায়ালার সাথে কি কোন অংশীদার আছে? বরং এরা সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে। (সূরা নমল-৬০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا-

কে এ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন? কে এর মাঝে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন? কে তাতে সুদৃঢ় পর্বত ও দু'সাগরের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন? (সূরা নমল- ৬১)

মহান আল্লাহ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। জমি এভাবে শক্ত করলেন না, যেন কোদাল দিয়ে খনন করে পিলার উঠাতে না পারে। আবার এমন নরমও করলেন না, যাতে কোন গাছ রোপণ করা না যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা কর না? বীচি মাটির ভেতরে দিয়ে দিলে আর মাটি ফেটে গিয়ে নরম পাতা উদ্গত হয়ে গেল। মাটি থেকে কে এই পাতা উদ্‌গত করল? মাটি এমনভাবে সৃষ্টি করলেন যে, ছোট দু'টি পাতা মাটি ফেড়ে উপরে চলে আসতে পারে। আবার একশ' চল্লিশ তলা বিল্ডিং বানাচ্ছেন মাটি ধসে বিল্ডিং মাটির নিচে চলে যাচ্ছে না। এভাবে মাটিকে বসবাসের উপযোগী করে কে বানালেন? আল্লাহ বলেছেন আমি বানিয়েছি।

পানিকে আল্লাহ তায়ালা দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। একদিকে লোনা পানি, অন্যদিকে মিষ্টি পানি। তাও কি চোখে দেখো না? চোখে দেখে না নাস্তিক এবং মুরতাদরা, ওদের চোখে ধরা পড়ে না? কিন্তু ঈমানদারদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে। পৃথিবীর সকল উল্লেখযোগ্য বিষয় রেকর্ড করা হয় গ্রীনিজ বুক নামক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে একটি নদী আবিষ্কার হয়েছে। সে নদীটি আড়াইশত কিঃ মিটার প্রস্থ এবং চার হাজার কিঃ মিটার দীর্ঘ।

www.pathagar.com

এর পানি মিষ্টি। চতুর্দিকের লোনা পানির সমুদ্রের মাঝখানে মিষ্টি পানির এই বিরাট নদী। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيَانِ–

তিনি প্রবাহিত করেন দু'টি সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত; কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (সূরা আর্ রাহ্মান)

মাঝখানে কোন বাধা নেই। অথচ লোনা পানির কোন ক্ষমতা নেই মিষ্টি পানিকে লোনা বানায়। এগুলো চোখে দেখো না? মহান আল্লাহ্ বলছেন–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ، اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

এই যে নদীর পানিকে আল্লাহ্ তায়ালা ভাগ করে দিলেন এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্র সাথে কেউ শরীক ছিল? বরং তোমরা এ ব্যাপারটি অনুধাবন করো না, বুঝতে চেষ্টা কর না। (সূরা নমল)

মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الاَرْضِ–

এমন কে আছে যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। আর তোমাদেরকে দুনিয়ার খলীফা বানিয়ে দিয়েছেন। (সূরা নমল-৬২)

তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা। গভীর রাতে আপনি যে ক্রন্দন করেন, মামলা-মোকদ্দমায় পড়ে, ঋণগ্রস্ত হয়ে, রোগাক্রান্ত হয়ে, ব্যথা-বেদনা নিয়ে, অস্থির মন নিয়ে আপনি যে দোয়া করেন সে দোয়া তো আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ শ্রবণ করেন না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি সব দেখতে পাই, শ্রবণ করতে পারি। এমন কিছু নেই যা আমি দেখি না, শ্রবণ করি না। সমুদ্রের অতল তলদেশে শৈবালের সাথে লাগানো ছোট্ট একটি পোকা যা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, তাও আমি দেখি। আটলান্টিক মহাসাগরের অতল তলদেশে যদি ছোট একটি পোকা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করে, তাহলে পৃথিবীর কেউ সে চিৎকার শুনতে পায় না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আরশের মালিক আমি আল্লাহ্ সে পোকার চিৎকার শ্রবণ করি। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

www.pathagar.com

إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাথে কি কোন অংশীদার আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরা নমল)

আজ মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে কিন্তু উপকার কতটুকু তা আমাদেরকে দেখতে হবে। পৃথিবীর মানুষ যেখানে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, যে অর্থ ব্যয় করা হলো মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য, সে অর্থ দিয়ে যদি বিদ্যুৎ তৈরি করা হতো তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া যেত। যে অর্থ দিয়ে মারণাস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে মানুষ মারার জন্য, সে অর্থগুলো যদি একত্রিত করা হত, তাহলে প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেয়া যেত। মানুষ মারার জন্য যে সব অস্ত্র তৈরি করা হয়, সে অর্থ দিয়ে যদি পৃথিবীতে হাসপাতাল তৈরি করা হত তাহলে মানুষ আর বিনা চিকিৎসায় মারা যেত না। আজ অনর্থক অর্থ খরচ করা হয়। এই খরচ করার কি মূল্য?

হিমালয় পর্বতের ওজন কত তা বের করার জন্য অর্থ খরচ করার কোন যুক্তি নেই। আবার আটলান্টিক মহাসাগরে কত কোটি গ্যালন পানি আছে তা বের করার জন্য অর্থ ব্যয় করার কোনো যুক্তি নেই। এ ব্যাপারে লক্ষ কোটি ডলার খরচ করার কি মূল্য আছে? মানুষ মঙ্গল গ্রহে যায়, চাঁদে যায়। যাক্ না, কোন ক্ষতি নেই। যে গবেষণায় মানবতার কল্যাণ হয়, পৃথিবীর কল্যাণ হয়, অর্থ সেখানে খরচ করুক; কিন্তু পৃথিবীর একশ্রেণীর মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ যে, মানবতার কল্যাণে অর্থ খরচ করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ-

আর কে জল-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? (সূরা নমল-৬৩)

কে তিনি? যিনি জলে, স্থলে, অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান। সমুদ্রের ভেতরে নাবিকেরা যখন পথ চলে, দিনের বেলায় সূর্য দেখে নাবিকেরা পথ নির্ণয় করে; কিন্তু রাতের বেলায় অন্ধকারে নাবিকেরা যেন পথ হারিয়ে না ফেলে সে জন্য আমি আকাশকে তারকাখচিত করে রেখেছি। তারকা দেখে নাবিকেরা পথ নির্ণয় করে গন্তব্যে পৌঁছে যায়, পথ হারিয়ে যায় না। অন্ধকারের ভেতর আমিই তাদের

www.pathagar.com

পথ নির্ণয় করে দেই। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهَ تَعَلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

ঐ আল্লাহর সাথে কি কোন শরীক আছে যে আল্লাহর সাথে উক্ত কাজে সহযোগিতা করেছে। যারা শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ মুক্ত। (আন্ নামল-৬৫)

অর্থাৎ তিনি বৃষ্টি বর্ষণে বৃষ্টির আগে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে বৃষ্টি আসছে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। এ কাজের মধ্যে কি কেউ আল্লাহর শরীক আছে? মহান আল্লাহ বলেন–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ–

আল্লাহর সাথে কি কোন অংশীদার আছে? যদি তোমাদের কাছে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। (সূরা নমল)

আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, সৌর জগত, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ইত্যাদি যা কিছু আমি বানিয়েছি এতে আমার সাথে কে শরীক আছে? যদি তোমাদের কাছে যুক্তি থাকে তাহলে তা পেশ কর। এদের কাছে যুক্তি হল আকাশ বলতে কিছুই নেই, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوتِ وَالاَرْضِ–

আল্লাহই তো আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার পুত্র-কন্যা কি করে হতে পারে? ইহুদী–খৃষ্টানরা দাবী করেছে আল্লাহ তায়ালার ছেলে আছে। খৃষ্টানরা আল্লাহর স্ত্রী পর্যন্ত বানিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ ছোট্ট একটি সূরার ভেতরে তাওহীদের কথা এমনভাবে পেশ করেছেন যে, গোটা পৃথিবীর মানুষ যদি হেদায়েত পেতে চায় তবে এ ছোট্ট সূরাই তাদের জন্য যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ–

হে নবী আপনি বলে দিন! আল্লাহ এক এবং একক। তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আকাশ এবং যমীনে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাছ)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা এক এবং একক, তাঁর এ একত্বের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি অসংখ্য পয়গাম্বর এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সকল পয়গাম্বর দাওয়াত দিয়েছেন–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ–

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, কোন আইনদাতা, বিধানদাতা, শাসনকর্তা, পালনকর্তা এবং কোনো রিয্কদাতা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلَّذِىْ جَـعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِـرَاشًـاوَّ السَّـمَـاءَ بِنَاءً وَّاَنْـزَلَ مِـنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْـرَجَ بِـه مِـنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًـالَّكُمْ–

আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা)

এই পানি হচ্ছে মানুষের জন্য জীবন। এ জন্যই পানির অপর নাম জীবন বলা হয়। এই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করেন মহান আল্লাহ তায়ালা। এই পানি যদি কয়েক ফুট উঁচু হয়ে আসে তাহলে আল্লাহ এর মাধ্যমে মানুষকে শেষ করে দিতে পারেন। আবার আল্লাহ ইচ্ছা করলে পানির ভেতরেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। সমস্ত কর্তৃত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহর। আবার আল্লাহ তায়ালা আগুনের ভেতর থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারেন। সব কিছুই আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ تَـعُدُّوْا نِـعْمَتَ اللّٰـهِ لَا تُـحْـصُـوْهَـا–

তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা নহ্ল-১৮)

মহামহিমাময় পরম ক্ষমতাশালী মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, অতীন্দ্রিয় লা-শারীক মহান আল্লাহ ব্যতীত আল কোরআন অবতীর্ণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, আল কোরআন তাঁরই অবিনশ্বর অলৌকিক নিদর্শন। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে অবতীর্ণ কোরআনের বক্তব্য এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নের যন্ত্র কম্পিউটারের রায় যখন এক হয়ে যায়, তখন বিস্ময় জাগে। মনে হয় আজকের কম্পিউটার শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করেছে যা পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَـعَتِ الْاِنْـسُ وَالْـجِـنُّ عَـلٰى اَنْ يَّـاْتُـوْا بِمِـثْـلِ هٰـذَا الْقُـرْاٰنِ

www.pathagar.com

لَايَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا-

হে রাসূল আপনি বলে দিন! যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআন মাজীদের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (বনী ইসরাঈল)

মাত্র কয়েক দশক আগে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গ্রহ এবং সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে তাদের সকল গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সর্বজন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্ব ছিল একটি বিশাল বস্তুপিণ্ড মাত্র। পরে ঐ বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটলো এক বিস্ফোরণ, ফলে বিশাল বস্তুটি খণ্ড খণ্ড বস্তুতে বিভক্ত হয়ে একটি আদি ভরবেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এভাবে সৃষ্টি হলো চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু। আজ অবধি তারা তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃত্তাকারে ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে দিনের পর দিন। এক সময় বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত দিল যে, পৃথিবী স্থির, সূর্য তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ; কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত দিল সূর্য স্থির পৃথিবী ঘুরছে। এ মতবাদগুলো ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সত্য হচ্ছে মহাবিশ্বের সকল বস্তুই বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞানী সমাজ মাত্র কয়েক দশক আগে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আজ হতে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ কথাই বলেছেন–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا-

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া- ৩০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিন–রাত এবং চন্দ্র–সূর্য সম্পর্কে বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। সব আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া-৩৩)

www.pathagar.com

এমনিভাবে যদি বিজ্ঞানীদেরকে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তারা বলবেন, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে সমুদ্রের বুকে প্রাচীন বস্তুকণা থেকে প্লাটোপ্লাজম–এর উৎপত্তি হয়। এই প্লাটোপ্লাজম থেকেই জন্ম নেয় এমিবা নামের ক্ষুদ্রতম এককোষী প্রাণী। এভাবে সমুদ্রের উৎস থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাণীর জন্ম হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমুদ্র থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম। অর্থাৎ সমুদ্র বা পানিই হচ্ছে সকল প্রাণের উৎস। এই তথ্য বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন মাত্র কিছুদিন পূর্বে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় কয়েক দশক, মাত্র কয়েকদিন বটে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে চৌদ্দশত বছর আগে ঘোষণা করেছেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ–

আর প্রাণবন্ত সব কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এর পরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (সূরা আম্বিয়া-৩০)

প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে অবশ্যই পানির প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাযুক্ত নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে কাছীর ইমাম আহমাদের সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।

পৃথিবী ব্যতীত আরো পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্বের কথা প্রাচীন কাল থেকে মানুষ জানতো। আধুনিক কালে আরো তিনটি গ্রহের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে এগারটি গ্রহ দেখেছিলেন। সে স্বপ্নের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন–

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لاَبِيْهِ يَاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سجِدِيْنَ–

www.pathagar.com

'যখন ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, হে আব্বাজান, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য আমার উদ্দেশ্যে সিজদা করছে।' (আল কোরআন)

উপরোক্ত আয়াতে কার্যত হযরত ইউসুফ (আঃ) এর এগার ভাই (এগারটি গ্রহরূপে) এবং তাঁর পিতা ও মাতা (চন্দ্র ও সূর্যরূপে) তাঁকে সিজদা করেছিলেন। মিশরে উপস্থিতির পর প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন হযরত ইউসুফ (আঃ) এ ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন, একথা পবিত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

সূর্যের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনই প্রথমবারের মত মানুষকে এ তথ্য দিয়েছে যে, সূর্যের একটি কক্ষপথ বা গতিপথ রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ– وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

সূর্য কখনও ধরতে পারবে না চন্দ্রকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করতে পারবে না দিবসকে, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে। (সূরা ইয়াছিন)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের দিকে আধুনিক বিজ্ঞান জানতে পেরেছে যে, আমাদের ছায়াপথ এবং সূর্যেরও একটি গতিপথ আছে এবং তাদের নিজ নিজ মেরুদণ্ডের ওপরে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের কেন্দ্রকে আবর্তন করে আসতে মোট সময় লাগবে পঁচিশ কোটি বছর। একথা মাত্র এই শতাব্দীতে জানা গেছে যে, কোপার্নিকাসের থিওরী মতে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করলেও সূর্য স্থির বসে নেই, আর পবিত্র কোরআনে কারীম চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই তথ্য প্রদান করেছে যখন এ সম্পর্কে মানুষের কোন কিছুই জানা সম্ভব ছিল না।

ছায়াপথের আলোক-রশ্মির বহু বর্ণ-বিভা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়রত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন ছায়াপথের বর্ণালী বিভা ক্রমান্বয়ে লালচে হয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য থেকে তাদের এই ধারণা জন্মে যে, ছায়াপথগুলো ক্রমশ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের পরিমণ্ডল ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে; কিন্তু মহান আল্লাহ এই তথ্য দিয়েছেন প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে কারীমে বলেছেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

www.pathagar.com

আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, ধনীগণ, বিত্তশালীগণ, প্রচন্ড ক্ষমতাধর, শক্তির নিরিখে কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আকাশমন্ডলের প্রসঙ্গে উক্ত শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী। সুতরাং এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুর থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না। যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের কোন অস্তিত্বই থাকতো না।

সুরক্ষিত মহাকাশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশে তথা উর্ধ্বজগতে কত সহস্র ধরনের বিশালাকারের অকল্পনীয় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে সামান্য ধারণা ওপরে পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই আকাশ মন্ডল কিসের ওপর নির্ভর করে ওপরে অবস্থান করছে? এই প্রশ্নের জবাব কোন মানুষ বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। কোন বিষয়ে মানুষ জ্ঞানার্জন করলে বা জ্ঞান থাকলে তাকে সে বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যেতে পারে। আসলে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আকাশের কোন সন্ধানই লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সর্বাধুনিক দূরবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাদের চোখে যা ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে তারা পৃথিবীবাসীর কাছে ধারণা পেশ করেছেন। আকাশের কোন ঠিকান তারা খুঁজে পাননি। মহাশূন্যের অসংখ্য জগৎ সম্পর্কে তারা বলেছেন, সেখানে এমন ধরনের অদৃশ্য শক্তি বিরাজ করছে যে, তারা প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহকে এক আকর্ষণী শক্তির মাধ্যমে যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا–

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (সূরা রা'দ-২)

কোন পিলার বা স্তম্ভ নেই, মানুষের দৃষ্টিতে কোনকিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না অথচ আকাশ ঠিকই যথাস্থানে অবস্থান করছে। অদৃশ্যমান কোন নির্ভরের ওপরে আকাশ

www.pathagar.com

স্থির রয়েছে। এই আকাশ জগতে আল্লাহ তা'য়ালা যে অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার বিশলতা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না, সেসব জগৎ একটির সাথে আরেকটি সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করছে না। উর্ধ্বজগতের এমন সব অংশ যার ভেতরকার প্রতিটি অংশকে অত্যন্ত শক্তিশালী সীমান্ত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। যদিও এ সীমান্ত রেখা মহাশূন্যে অদৃশ্যভাবে অঙ্কিত রয়েছে তবুও সেগুলো অতিক্রম করে কোন জিনিসের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ–

আকাশে আমি অনেক শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি। (সূরা হিজর-১৬)

উল্লেখিত আয়াতে 'বুরুজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বুরুজ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, দূর্গ, শক্তিশালী ইমারত বা প্রাসাদ। মহান আল্লাহই ভালো জানেন তিনি উর্ধ্বজগতে কি ধরনের বুরুজ নামক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উর্ধ্বজগৎ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তা যেসব স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীতে প্রেরণ করে, সেসব স্তরই বুরুজ হতে পারে। আবার উর্ধ্বজগতে শয়তানের প্রবেশ পথে যেসব বাধা নির্মাণ করা হয়েছে, তাও বুরুজ হতে পারে। সুতরাং আকাশ জগতসমূহে কোথাও কোন দুর্বলতা নেই। সবকিছু নির্মিত হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির ওপরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ–

এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে না? কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি আর তাতে কোথাও কোন ধরনের ফাঁক ও ফাটল নেই। (সূরা ক্বাফ–৬)

আকাশ জগতের এই বিস্ময়-উদ্দীপক বিশালতা সত্ত্বেও এই বিরাট বিস্তীর্ণ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি ধারাবাহিক ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা এবং এর বন্ধন, গ্রন্থনা এতই দৃঢ়–দুশ্ছেদ্য যে, তার কোথাও কোন ধরনের ফাটল বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। এর ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا-

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (সূরা আল ফুরকান–৬১-৬২)

যে আল্লাহর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে, তিনি অসীম বরকত সম্পন্ন। তিনি আকাশকে পৃথিবীর ছাদ হিসাবে নির্মাণ করে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করেননি। সূর্যকে সেখানে প্রদীপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই সূর্যরশ্মির ভেতরে এমন উপাদান রেখেছেন, যা পৃথিবীর প্রাণীসমূহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যের তাপ ব্যতিত পৃথিবীতে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না, নতুন কিছু সৃষ্টিও হতে পারে না। আকাশ মন্ডলে তিনি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে আলো দান করেছেন। মাথার ওপরে তারাজ্বলা অপূর্ব সৌন্দর্য মন্ডিত আকাশ দেখে মানুষ আমোদিত হবে, মায়াবী চাঁদের জ্যোসনায় অবগাহন করে হৃদয়-মন জুড়াবে। ক্লান্তি দূরিকরণে রাতকে তিনি দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য, দিনকে দিয়েছেন জীবন ধারনের উপকরণ সন্ধানের জন্য।

উর্ধ্বজগতে ক্ষতিকর রশ্মি

মাথার ওপরে তারাজ্বলা আকাশের সেই অদৃশ্য জগৎ থেকে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে অবর্ণনীয় গতিতে মৃত্যু দুতের মতই ছুটে আসছে অসংখ্য ক্ষতিকর আলোক রশ্মি। পরম করুণাময় আল্লাহ যে অদৃশ্য প্রতিরোধক শক্তি মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন, এসব রশ্মির গতি পথে তারা প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করে। কতকগুলো রশ্মি ফিল্টারে প্রবেশ করে। এভাবে ছেঁকে ক্ষতিকর কণাগুলো ধ্বংস করে কল্যাণকর কণাগুলোকে পৃথিবীতে আসার অনুমোদন দেয়া হয়। করুণার সাগর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন।

উর্ধ্বজগৎ থেকে ক্ষতিকর কণাগুলোর দু'চারটি যদিও বা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, ঐসব চৌম্বক ক্ষেত্র তখন দয়াময়ের নিদের্শে সক্রিয় হয়ে ওঠে। চৌম্বককে দান করা প্রবল আকর্ষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেসব ক্ষতিকর কণাগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মেরু অঞ্চলের দিকে–যেখানে কোন জীবনের স্পন্দন নেই। রাহ্মান তাঁর সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

মহাকাশে শৃঙ্খলা

পবিত্র কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিভাবে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেমন করে তার সাংগাঠনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে আকাশকে কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিত যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মানুষকে ধারণা দান করেছে। আকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি। তারা প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি এখনো গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। মানুষ সসীম জ্ঞানের অধিকারী। কোন কিছু সম্পর্কে এরা সঠিক জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা এদের স্বভাব। আকাশের ঠিকানা আবিষ্কারে ব্যর্থ কেউ কেউ আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছে, আকাশ বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীর ধূলিকণা মহাশূন্যে বায়বিয় স্তরে পুঞ্জিভূত হয় এবং তার ওপরে সূর্যের আলো পতিত হবার ফলে তা নীল দেখায়। প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এই আকাশের যিনি স্রষ্টা তিনি বলছেন–

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ–

আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নয়নাভিরাম নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি। (সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত-৬)

উল্লেখিত আয়াতে পৃথিবীর আকাশ বলতে সেই আকাশকেই বুঝানো হয়েছে, যা আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী। যে আকাশকে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিতই খালি চোখে দেখে থাকি। এই আকাশ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ যে বিশ্বকে দেখে থাকেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখন পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী আকাশ।

কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 'সাব'আ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার সরল অনুবাদ করা হয়েছে 'সাত আকাশ'। আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য মানুষের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যে শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হবে, সেই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআনে কোন জটিলতা রাখা হয়নি। আরবী পরিভাষায় 'আলিফ' বলতে অগণিত কিছু বোঝায়। এখন কেউ যদি এই আলিফ বলতে শুধুমাত্র একহাজার বুঝে, তাহলে সে তার জ্ঞান অনুযায়ী তা বুঝতে পারে। কিন্তু এই আলিফ দিয়ে আল্লাহর কোরআন অসংখ্য অগণিত বুঝিয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন সূরা কদরে 'লাইলাতুল কাদরি মিন আলফি শাহ্‌রে' বলতে বুঝানো হয়েছে অসংখ্য অগণিত মাসের থেকেও উত্তম হলো কদরের রাত। আবার কিয়ামত সংঘটিত হবার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে কোরআন 'সুর' শব্দ ব্যবহার করেছে। এই 'সুর' শব্দের অর্থ হলো শিঙ্গা। হযরত ইসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন, কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্তও কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারের জন্য ঢেড়া পিটিয়ে বা শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষকে একত্রিত করা হয়। এখানো সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করার জন্য বিউগল বাজানো হয়। অর্থাৎ মানুষ এই শিঙ্গা শব্দটির সাথে পরিচিত, এ কারণে কোরআন শিঙ্গা শব্দই ব্যবহার করেছে। এদেশেও কথার মাঝে মানুষ সীমাহীন দূরত্ব বুঝাতে 'সাত সমুদ্দুর তের নদী–সাত তবক আসমান' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করে থাকে। অমূল্য কোনকিছু বুঝাতে 'সাত রাজার ধন' বাক্যটি ব্যবহার করে। এ জন্য আল্লাহর কোরআন অসংখ্য আকাশকে বুঝাতে 'সাব'আ' বা সাত আকাশ শব্দ ব্যবহার করেছে, যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، وَمَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنَّهُ فِى الاَرْضِ، وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُوْنَ–

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপরে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে মোটেও অমনোযোগী নই। আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসাব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে সক্ষম। (সূরা মুমিনুন)

মহান আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি করেই তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। কোনটি কিভাবে পরিচালিত হবে, কোন সৃষ্টির কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি মোটেও অমনোযোগী নন। তাঁর সৃষ্টি অসংখ্য জগৎ যেন যথা নিয়মে পরিচালিত হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তা'য়ালা একই সঙ্গে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে বর্ষণ করেছিলেন যা পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে পানিকে সংরক্ষণ করার

www.pathagar.com

কারণেই নদী, সাগর-মহাসাগর ও জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে, ভূগর্ভেও বিপুল পরিমাণ পানি রিজার্ভ রয়েছে। এই পানিই চক্রাকারে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঝরণা ও কুয়া, ডিপ টিউবওয়েল এই পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে।

মহাশূন্যে বাতাসের ঘনস্তর

পৃথিবী নামক এই গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সম্মুখ ভাগে একবার আসে এবং আবার পিছনের দিকে সরে যায়। এরই ফলে দিন ও রাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি পৃথিবীর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে অবস্থান করতো এবং অন্য দিকটি সময় সময় সূর্যের আড়ালে অবস্থান করতো, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে সক্ষম হতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচন্ড উত্তাপ পৃথিবীর সূর্যের দিকে একইভাবে অবস্থানরত অংশকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণহীন করে দিতো।

উল্কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এই ভূ-মন্ডলের প্রায় আটশত কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত বাতাসের একটি ঘনস্তর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি এ ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে প্রতিদিন কোটি কোটি বিশালাকারের উল্কাপিন্ড প্রতি সেকেন্ডে আট চল্লিশ কিলোমিটারেরও অধিক গতিতে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। এর ফলে পৃথিবীতে যে ধ্বংস লীলা সাধন হতো তাতে করে মানুষ, পশু-প্রাণী, বৃক্ষতরু-লতা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। সকল কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চর্বিত তৃণের ন্যায় ধারণ করতো।

মহাকাশে পাথরের সাম্রাজ্য

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলেন–

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ–

আকাশের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপরই তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক (চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্ষুণি) নিষ্প্রভ করে দিয়ে যাবে। (সূরা আন নূর-৪৩)

www.pathagar.com

এই পৃথিবীতেই শুধু পাথরের খনি বিদ্যমান নেই, আল্লাহ তা'য়ালা যে আরো অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও পাথর বিদ্যমান। মাহশূন্য সম্পর্কে যাদের সামান্য লেখাপড়া রয়েছে, তারা এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, মহাশূন্যে বিশালাকারের একটি পাথরের জগৎ রয়েছে। মহাকাশে শূন্যতার মহাসমুদ্রে ভাসমান পাথরের জগৎ বিদ্যমান। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্য বলয়ে এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্ট রয়েছে। এটাই হলো এককভাবে পাথরের জগৎ। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গ্রহেই পাথর রয়েছে। মহাশূন্যে ভাসমান পাথরের এই জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন মাত্র উনিশ শতকে। অথচ আল্লাহর কোরআন এ জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে সেই সপ্তম শতাব্দীতে।

আল্লাহর কিতাবের সূরা জ্বিন-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে মহাশূন্যে পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞান অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে একটি সুবিশাল পাথরের বেল্ট, একটি ভাসমান পাথরের জগৎ। পাথরের এই জগৎ নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ মারাত্মক শঙ্কিত রয়েছেন। কি জানি, কখন কি অবস্থায় এসব পাথর পৃথিবীর দিকে সেকেন্ডে শত শত কিলোমিটার গতিতে ছুটে এসে আঘাত হেনে মানব সভ্যতাকে অস্তিত্বহীন করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আকাশে যে শতকোটি নানা ধরনের জগৎ বিদ্যমান, এসব জগতই একদিন পৃথিবী নামক গ্রহটির সর্বনাশ করে ছাড়বে। হয়ত তাদের ধারণা একদিন বাস্তবে পরিণত হলে হতেও পারে। কারণ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহর আদেশে সমস্ত আকর্ষণ বলয় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে মহাশূন্যে শতকোটি বিশালাকারের গ্রহ-উপগ্রহ পরিচালিত করছেন, সে আকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব থাকবে না, তখন তা পৃথিবীতে পতিত হবে।

বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, সুমেকার লেভী-৯ নামক একটি গ্রহের মাত্র একুশটি পাথর নিপতিত হয়েছিল বৃহস্পতি গ্রহের ওপর। যার ক্ষমতা ছিল প্রায় আড়াই কোটি মেগাটন টিএনটি'র ধ্বংযজ্ঞের। ছয়শত পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে একবার প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি ঝুলন্ত পাথর আঘাত করে এক মহাধ্বংস যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিল।

জীব বিজ্ঞানীদের ধারণা সে আঘাতেই বিরাটাকারের প্রাণী ডাইনোসোর পৃথিবী থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে অসংখ্য পাথরের দল মহাশূন্যে চলমান অবস্থায় রয়েছে। এগুলো পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে না। কে এগুলোর পতন রোধ করেছেন? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ، وَحِفْظًا، ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

আর পৃথিবীর আকাশকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা। (সূরা হামীম আস সাজদাহ্-১২)

মহাশূন্য থেকে শুধু উল্কাই নয়, এমন অসংখ্য রশ্মি পৃথিবীর দিকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসছে যে, তা পৃথিবীতে পতিত হবার সুযোগ পেলে মুহূর্তে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি প্রাণী বসবাসের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আকাশকে সুরক্ষিত ছাদের মতো না করলে সূর্য থেকে আগত সৌর ঝন্‌ঝা পৃথিবীর ওপরে প্রচন্ড উত্তাপ আর ঝড়ের ধ্বংস আঘাত হানতো যে, পৃথিবীর বুকে কোন জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে এসটিরয়েড ও মিটিওরের বেল্ট থেকে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় কমবেশী ত্রিশ লক্ষ উল্কা পতিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। কোন সে বিজ্ঞানী যিনি বিশালাকারের উল্কাগুলো মহাশূন্যের গ্যাসীয় বলয়ে মিশিয়ে দিচ্ছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا-

আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আল আম্বিয়া-৩২)

মহাকাশে বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য ছাতা

রাব্বুল আলামীন বায়ু মন্ডলে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য অথচ দৃঢ় ছাদই ক্ষতিকর বিকিরণ ছেঁকে যা পৃথিবীর পরিবেশের জন্য কল্যাণকর সেসব রশ্মি প্রবেশ করতে দেয়। এক্সরে আয়নোস্ফিয়ার ও আলট্রাভায়োলেট স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে মাত্রাতিরিক্ত অবলোহিত রশ্মি ট্রপোস্ফিয়ারে বিশোষিত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় রশ্মিরাই প্রতিপালন ব্যবস্থায় বিস্ময়করভাবে পৃথিবী পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে সোলার উইন্ড এবং লক্ষ লক্ষ উল্কাপতনের কবল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এই অদৃশ্য ছাদই প্রতিরোধ্যতায় অটল-অবিচল। আল্লাহ তা'য়ালা বাতাস সৃষ্টি করেছেন। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও

www.pathagar.com

উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। বাতাসের অনুপস্থিতিতে এ পৃথিবী কোন প্রাণী বসবাসের উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতো না।

এই ভূ-মন্ডলের ভূ-ত্বকের নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করেছেন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। পৃথিবীর যে অঞ্চলে এসবের অবস্থান নেই, সে অঞ্চলের ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী নয়।

পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভান্ডার গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পাহাড়ের ওপরও পানির বিশাল ভান্ডার ঘনীভূত করে এবং পরবর্তীতে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তিনি রব, এ ব্যবস্থা যদি তিনি না করতেন, তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। আবার এই পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব বস্তুর অবস্থান রয়েছে সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এই গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের থেকে কম হতো তাহলে পৃথিবী বাতাস ও পানি শূণ্য হয়ে যেতো এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি লাভ করে এমন প্রচন্ড আকার ধারণ করতো যে, প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো।

মাধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হতো, তাহলে বাতাস এতটা ঘন হয়ে যেতো যে, কোন প্রাণী নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারতো না, মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি লাভ করতো এবং জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হতো না, ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না, শীতলতা বৃদ্ধি লাভ করতো, ভূ-পৃষ্ঠের কোন এলাকাই বাসযোগ্য হতো না বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এতটা বৃদ্ধি লাভ করতো যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না।

রাব্বুল আলামীন পৃথিবী নামক এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দুরত্বে রেখেছেন। এরচেয়ে কম দূরত্বে যদি রাখতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে ভষ্ম হয়ে যেতো। যদি অধিক দূরত্বে রাখতেন তাহলে পৃথিবী প্রচন্ড ঠান্ডায় বরফে পরিণত হতো। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জগতকেই সঠিক পরিমাপে নির্দিষ্ট কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করার ব্যবস্থা করেছেন।

গ্রহসমূহ কক্ষপথে সন্তরণশীল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এসব জগৎ তিনি ঠিকানা বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি। প্রতিটি জগত-ই তার নির্দিষ্ট গতি পথে পরিভ্রমণ

www.pathagar.com

করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা নেই দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষ পথে সন্তরণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

সুদূর অতিত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, এটাই শেষ না এর পরেও আরো কিছু জানার অবশিষ্ট আছে? এ কথা দৃঢ়তার সাথে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে, জ্ঞানের শেষস্তর পর্যন্ত সে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। চূড়ান্ত কথা তখনই বলা সম্ভব হবে, যখন বিশ্বজগতের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞানের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এটাই যে, মানুষের অর্জিত জ্ঞান প্রতিটি যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানেও মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, যে কোন সময় তা পরিবর্তন হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য সম্পর্কে মানুষ যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করেছে। এক সময় লোকজন চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস অন্তরে লালন করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এ ধারণা কিছু দিন প্রতিষ্ঠিত থাকার পর বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে এ ধারণা আবার প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সূর্য তার নিজের অবস্থানে স্থির রয়েছে এবং গোটা সৌরজগৎ তাকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে।

কালের আবর্তনে উল্লেখিত ধারণা স্থায়ী হলো না। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলো যে, শুধু সূর্যই নয়, মহাশূন্যে যা রয়েছে, তা সবই একদিকে ছুটে চলেছে। যে যার কক্ষপথে সঞ্চালনশীল। এসব কিছুর চলার গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ষোল কিলোমিটার থেকে একশত একষট্টি কিলোমিটার পর্যন্ত। আল্লাহর কিতাবের সূরা ইয়াছিনের উক্ত আয়াতে যে 'ফালাক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ এবং আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত কিছুই কক্ষপথে সন্তরণশীল। মুফাচ্ছিরগণ এ আয়াতের চার ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কেউ বলেছেন, শুধুমাত্র চন্দ্র, সূর্য নয়–বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগৎ আবর্তন করছে। আবার কেউ বলেছেন, এদের প্রতিটির আকাশ অর্থাৎ

www.pathagar.com

প্রতিটির আবর্তন পথ বা কক্ষপথ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন করছে। কারো ব্যাখ্যা হলো, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে, যেমন কোন তরল পদার্থে কোন বস্তু ভেসে চলে, ঠিক তেমনি মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই ভেসে চলছে।

যে বা যিনি যে ধরনের ব্যাখ্যাই দিন না কেন, একটি কথা স্মরণে রেখে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, কোরআন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের বিষয়সমূহ উপস্থাপন করতে গিয়ে সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর ভেতর দিয়েই বিজ্ঞানের নানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কোরআন নিরেট বিজ্ঞানের কিতাব।

বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার অর্থ হলো, মানুষকে এ কথা বুঝানো যে, যদি সে সমস্ত কিছুর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং নিজের জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি-প্রমাণের এক বিশাল সমাবেশ দেখতে সক্ষম হবে।

এসব সৃষ্টিসমূহের ভেতরে মানুষ কোথাও আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার ও অংশীদারিত্বের স্বপক্ষে সামান্যতম যুক্তি ও প্রমাণও অনুন্ধান করে পাবে না। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এসব যথা নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, কোন সুদক্ষ স্রষ্টা ব্যতিত এসব কি এমনিতেই চলতে পারে ? শতকোটি জগৎ একটি নিয়মের অধীনে চলছে, স্রষ্টার যদি কোন অংশীদার থাকতো, তাহলে এসব পরিচালনা করতে গিয়ে অবশ্যই মতানৈক্য ঘটতো এবং তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই মানুষ দেখতে সমর্থ হতো। সুতরাং কোথাও যখন কোন অনিয়ম মানুষের চোখে পড়ছে না, তখন এ কথা কি অনুভব করতে অসুবিধা হয় যে, সৃষ্টি জগতসমূহের পেছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়? সমস্ত কিছুই যখন একটি নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন কি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়, পৃথিবীর মানুষেরও একটি পরিণতি রয়েছে? তোমরাই বলছো, সমস্ত কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে–এসব ধ্বংসের পরে তাঁর পক্ষে এসব আবার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি অসম্ভব? প্রথমবার যিনি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বদান করেছেন, দ্বিতীয়বারও তো তিনি অস্তিত্বদান করতে সক্ষম–এই সহজ সরল কথাটি তোমাদের মাথায় প্রবেশ করে না? সুতরাং আখিরাত অবশ্যম্ভাবী–এ কথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

www.pathagar.com

ছায়াপথই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুমাত্রিক জগতের ধারণা দিয়ে অবিশ্বাসীদের সামনে তাঁর অস্তিত্বই প্রকাশ করেছেন। এসব দেখেও যারা তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর একত্বে, রিসালাতের ওপরে, আখিরাতের প্রতি সংশয়যুক্ত মানসিকতা লালন করবে, তাদেরকে কপাল পোড়া ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হলো এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর ভরের তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আট শত গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের একশত নয় গুণ। ঘনত্ব একহাজার চারশত দশ গ্রাম বা ঘন সেন্টিমিটার।

সূর্যের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ–যার নাম দেয়া হয়েছে নেপচুন, সূর্য থেকে এর দুরত্ব কমপক্ষে দুই শত উনআশি কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটো নামক গ্রহটিকে দূরবর্তী গ্রহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে সূর্য তার দূরত্ব চারশত ষাট কোটি মাইলে গিয়ে উপনীত হয়। এত বড় বিশাল হবার পরও এ সৌরজগৎ একটি বিরাট বিশাল গ্যালাক্সী বা ছায়াপথের নিছক একটি ছোট্ট অংশ মাত্র।

মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সী বা ছায়াপথটির অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন অর্থাৎ তিনশত কোটি সূর্য রয়েছে এবং সে সকল সূর্যের সবচেয়ে কাছের সূর্যটি এই পৃথিবী থেকে এতদূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো পৃথিবীতে পৌছতে চার বছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

এই ছায়াপথই গোটা সৃষ্টিজগৎ নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীগণ যে অনুমান করেছেন, তাহলো প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এই ছায়াপথও একটি এবং ঐ বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের ভেতর থেকে সবচেয়ে কাছের নীহারিকা এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌছতে দশ লক্ষ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের যে নীহারিকাটি দেখেছেন, তার আলো পৃথিবীতে পৌছতে দশকোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। তারা বলছেন, এটাই শেষ নয়–এরপরও আরো অসংখ্য জগৎ রয়ে গিয়েছে, অসংখ্য নীহারিকা রয়ে গিয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এখনো ধরা পড়েনি। ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হলে, তার সাহায্যে অনেক কিছুই দেখা যেতে পারে। সুতরাং এ যাবৎ বিজ্ঞানীগণ আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে নমুনা দেখেছে, তার তুলনা করা যেতে পারে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার মধ্যে মাত্র একটি বালুকণার সাথে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির

www.pathagar.com

তুলনা যদি পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার সাথে করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানীগণ মাত্র একটি বালুকণার সমান অংশের সন্ধান পেয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যেসব উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং যে নিয়মের অধীন, গোটা সৃষ্টি জগতসমূহ সেই একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং সেই একই নিয়মের অধীন। পার্থক্য রয়েছে শুধু পরিবেশের। পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান ও অন্যান্য জগৎ সৃষ্টির উপাদান যদি একই না হতো, তাহলে এই পৃথিবীতে অবস্থান করে মানুষ যে অতি দূরবর্তী জগতসমূহ পর্যবেক্ষণ করছে, দূরত্ব পরিমাপ করছে এবং তাদের গতির হিসাব বের করছে, এসব করা কখনো সম্ভব হতো না।

সমগ্র সৃষ্টি জগতে একই ধরনের উপাদান ও নিয়ম কার্যকর রয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব করা সম্ভব হচ্ছে। সমস্ত জগতে যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা দক্ষতা, কলাকৌশল, শিল্পকারিতা, সৃষ্টির নিপুণতা, নান্দনিক সৌন্দর্য, উন্নত রুচির প্রকাশ, নিঁখুত শিল্পকর্ম, একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক এবং অগণিত গ্যালাক্সী ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে দেখা যায়, এসব দেখে কি কোন জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিমান মানুষ এ কথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে? এসব নিয়ম-শৃংখলার পেছনে কোন ব্যবস্থাপক, কোন কৌশলী শিল্পী, কোন মহাবিজ্ঞানী এবং মহাপরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব অনুপস্থিত? বিজ্ঞানীদের এসব আবিষ্কার ও কার্যাবলীই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সৃষ্টি জগতসমূহের স্রষ্টা আছেন এবং তিনি একজন। একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন মাত্র একটি সত্তা তথা আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

আকাশ একটি ছাদ বিশেষ

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে মানুষকে যেখানে প্রেরণ করবেন, সে পৃথিবীকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًاوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً-وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ-

www.pathagar.com

সেই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ হিসাবে নির্মাণ করেছেন, তারপর সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার সাহায্যে নানা ধরনের ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা বাকারা-২২)

পৃথিবীর স্থলভাগকে শুধু শুষ্ক মাটি আর বালির মরুভূমি বানিয়ে তিনি শ্রীহীন না করে সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَابِه نَبَتَا كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَكِبًا، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِه، اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِه اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِه–

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিত উৎপাদন করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষ-তরু-লতার সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা থেকে ফলের থোকা বানিয়েছেন, যা বোঝার ভারে নূয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙ্গুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ফলসমূহ পরস্পর স্বদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে, তখন এদের ফল বের হওয়া ও তা পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো। (সূরা আল আন'আম-৯৯)

আকাশের কোলে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি

কোনটি আল্লাহ্ অপূর্ণ রাখেননি। গোটা পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমুদ্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন। সমুদ্র নিশ্চল থাকলে তা দেখতে অসুন্দর মনে হতো। এ জন্য আল্লাহ্ সমুদ্রের বুকে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা দৃষ্টি-নন্দন করেছেন। পানির ভেতরে মাছ সৃষ্টি করেছেন। আকাশে কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকলে তা দেখতে কুৎসিত দেখাতো। তিনি সে আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

www.pathagar.com

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ-

তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। (সূরা মুল্‌ক-৫)

আল্লাহ বলেন, এই বিশ্বলোককে আমি অন্ধকারময় ও নিঃশব্দ নিষ্প্রভ করে সৃষ্টি করিনি। আকাশে তারকামালা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে অত্যন্ত মনোহর; উজ্জ্বল উদ্ভাসিত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছি। তোমরা রাতের অন্ধকারে তার উজ্জ্বল আলো ঝকমকে রূপ দেখে গভীরভাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ো। শুধু তাই নয়, আমি চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছি। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো-

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوتٍ طِبَاقًا-وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا-

তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন? আর সে আকাশে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা নূহ)

মহান আল্লাহর রুচিবোধ, তাঁর সৌন্দর্যবোধ; সৃষ্টির ভেতরে তাঁর শৈল্পিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি কত সুন্দর। প্রতিটি সৃষ্টির ভেতরেই তাঁর অকল্পনীয় উন্নত রুচির প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে তিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ-

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিলোকের যাবতীয় জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। (সূরা ইয়াছিন)

মহাকাশে চাঁদ-সূর্যের দুরত্ব

এই পৃথিবী যদি চাঁদের সমান হতো অথবা তার নিজস্ব ব্যাসের এক চতুর্থাংশ হতো, তাহলে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্তমানে যতটা রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশ হতো। এই ষষ্ঠাংশ শক্তি সম্পন্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখনো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলীয় পানিকে ধরে

www.pathagar.com

রাখতে সমর্থ হতো না। এই পৃথিবীতে মওজুদ সমস্ত পানির ভান্ডার দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতো। বাতাসের জলীয় বাষ্পমাত্রা বায়ুমন্ডলীয় বলয় থেকে বিমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি লাভ করতো ফলে এখানে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না। সূর্যের প্রাণঘাতী অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে পৌছে সমস্ত কিছু মুহূর্তে চিরকালের জন্য ভস্মীভূত করে দিতো। পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার জীবন সংক্ষরণ ক্ষমতা। বর্তমান ব্যাসের দ্বিগুণ হলে বর্ধিত পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠের চারগুণ হতো।

এমন একটি অবস্থায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বৃদ্ধি লাভ করতো বর্তমানের দ্বিগুণ যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সৃষ্টি করতো ৩০ পাউন্ড চাপ। মারাত্মকভাবে কমে যেত বায়ুমন্ডলের স্তরগত উচ্চতাসমূহ। এই উচ্চতা কমে যাওয়ার ফলে অনিবার্য ধ্বংসের ভয়াবহ বিভীষিকা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ উল্কা এই পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসে। আমরা অনুভবও করতে পারিনা, আল্লাহ উর্ধ্ব জগতে যে বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তার পুরুত্ব ও ব্যাপ্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রাণীকুল ও অন্যান্য বস্তুকে ধ্বংসকারী উল্কাপতন থেকে হেফাজত করে যাচ্ছে। পৃথিবীর আকারের বৃদ্ধি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বর্ধিত করে দিত, তাহলে নীচে নেমে আসতো বায়ুমন্ডলের এই অদৃশ্য প্রতিরোধী ব্যবস্থার বিস্তার। পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছার পূর্বে বায়ুমন্ডলীয় ঘর্ষণে ভস্মীভূত না হয়ে উল্কাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে আঘাত হানার পথ সুগম হয়ে পড়তো। ফলে মুহূর্তে সমস্ত প্রাণী মুহূর্তে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতো।

এই পৃথিবী বর্তমানে সূর্য থেকে যে দুরত্বে অবস্থান করছে, এর থেকে যদি দ্বিগুণ দুরত্বে সরিয়ে নেয়া হতো তাহলে পৃথিবী বর্তমানে সূর্যের কাছ থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ লাভ করছে, তখন লাভ করতো মাত্র এক চতুর্থাংশ। এই দুরত্বের কারণে বার্ষিক গতির মাত্রা হতো বর্তমানের অর্ধেক কিন্তু অক্ষ পরিধির পরিমাপ হতো বর্তমানের দ্বিগুণ। ফলে একটি বছরের পরিমাপ হতো চারটি বছরের সমান। এতে যে ফলাফল হতো তাহলো দুরত্ব জনিত কারণে তাপমাত্রার এক মারাত্মক হ্রাসপ্রাপ্তি যা বর্তমানের এক চতুর্থাংশ অথবা তারও কম মাত্রায় পৌছে যেতো। শীত মৌসুমের ব্যাপ্তি বর্তমানের চারগুণ দীর্ঘতর হয়ে যেতো ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ জমাট বদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এমনকি প্রচন্ড খরা মৌসুমে কোন একটি তরুলতাও প্রয়োজনের সময় এক বিন্দু মুক্ত পানি লাভ করতে সক্ষম হতো না।

www.pathagar.com

আবার পৃথিবীর সৌর দুরত্ব বর্তমান দুরত্বের অর্ধেক হলে কক্ষপথের পরিধি নেমে আসতো অর্ধেকে কিন্তু গতিবেগ হতো দ্বিগুণ। যার ফলে বর্তমানের একটি সৌর বছর হতো মাত্র ৩ মাস দীর্ঘ। এমন অবস্থায় সূর্য থেকে আগত তাপের পরিমাণ হতো বর্তমানের চেয়ে চারগুণ অধিক। ফলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে রাত ও দিনের আবর্তনের মাধ্যমে এসব কল্যাণ তাঁর সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। এসবের পেছনে স্রষ্টা যদি একজন না হয়ে অধিক হতো, তাহলে আবহমান কাল থেকে একই নিয়মে এসব চলতো না, ব্যতিক্রম অবশ্যই হতো।

সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদ

চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম মহাকাশীয় জ্যোতিষ্ক ও প্রাকৃতিক উপগ্রহ। এর ব্যাস প্রায় দুই হাজার মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মাত্র। পৃথিবী হতে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوتٍ طِبَاقًا، وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا–

তোমরা কি দেখতে পাওনা, কিভাবে আল্লাহ সাত আকাশ বানিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছেন, কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো (গ্রহণকারী) ও সূর্যকে (আলোদানকারী) প্রদীপ বানিয়েছেন। (সূরা নূহ-১৫- ১৬)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا–

কতো মহান সেই সত্তা, যিনি আকাশে অসংখ্য গম্বুজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রদীপসম একটি সূর্য এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ। (সূরা ফুরকান-৬১)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا–

সে মহান আল্লাহ সূর্যকে প্রখর তেজোদ্দীপ্ত করে বানিয়েছেন এবং চাঁদকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময়। (সূরা ইউনুস- ৫)

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞান ঘোষণা করেছে, চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত। অথচ এ মহাসত্য সেই সপ্তম শতাব্দীতেই পবিত্র কোরআন মানব জাতির সম্মুখে পেশ করেছে। পবিত্র কোরআনে চাঁদকে 'সিরাজ, দিয়া, শাম্‌স বা ওয়াহ্‌হাজ' নামে অভিহিত করা হয়নি। কারণ এসব শব্দের যা অর্থ এবং যে গুণ-বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলে ঐ শব্দসমূহ তার প্রতি প্রয়োগ হয়, তা চাঁদে নেই। এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে সূর্যের মধ্যে এবং এ কারণেই পবিত্র কোরআনে উক্ত শব্দসমূহ সূর্যের প্রতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ সূর্য তার অভ্যন্তরীণ দাহ্য শক্তির দ্বারা প্রচন্ড তাপ এবং আলো সৃষ্টি করে।

অপরদিকে পবিত্র কোরআনে সূর্যকে 'ক্বমার, মুনীর বা নূর' শব্দে বিশেষিত করা হয়নি। কারণ যে গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকলে এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা যাবে, তা সূর্যে নেই– চাঁদে রয়েছে। এ কারণেই এ সকল শব্দ চাঁদের পক্ষে প্রয়োগ হয়েছে। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো, দাহ্য শক্তি বা তাপ নেই। চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত।

বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের মানবসমাজ হতে বেশ কয়েকজনকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করাতে বাস্তবভাবে সফল হয়েছে। সাথে সাথে চন্দ্রের সর্ববিষয়ে অনেক ছবি পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছে। তাতে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে, চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই এবং সে কারণে চাঁদ নিজ দেহকে মহাজাগতিক পাথরখণ্ড বা গ্রহাণুদের সরাসরি আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে না। সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠটি মহাকাশীয় পাথর এবং ধূমকেতুর আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন দিয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। এ ক্ষতচিহ্নমূলক অধিকাংশ পুরানো গর্তগুলো গলিত লাভা দিয়ে প্রায় ভরে আছে। চাঁদের গঠন হচ্ছে কঠিন অমসৃণ মাটি ও পাথরস্তুপ দিয়ে। জলবায়ু না থাকায় ব্যাপকভাবে রুক্ষ ও বন্ধুর হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞান অবহিত করছে, যখন কোন পাথরখণ্ড বা গ্রহাণু মহাশূন্য হতে চাঁদের মধ্যাকর্ষণের কারণে তার পৃষ্ঠের দিকে সবেগে ছুটে আসতে থাকে তখন চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় এরা বিনা বাঁধায় এত প্রচণ্ড গতিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানে যে, পতিত স্থানে কল্পনাতীত ধাক্কায় Fusion পদ্ধতিতে পারমাণবিক বোমার মত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে ব্যাপক তাপের সৃষ্টি হওয়ায় পতিত স্থানে মুহূর্তেই বিরাট অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হয়। অগ্নিগোলকের প্রচণ্ড তাপে চাঁদের শক্ত-কঠিন মাটি, পাথর সব গলে গিয়ে উত্তপ্ত লাভায় পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ–

সূর্য এবং চন্দ্র (মহান আল্লাহর) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। (সূরা রাহ্‌মান-৫)

www.pathagar.com

সৌরজগতের পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বিশ হাজার কোটি তারার মধ্যে একটি মধ্যম ধরনের তারা হলো সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সৌরজগৎ গড়ে উঠেছে। সৌরজগতে যতো কিছু রয়েছে তার নিরানব্বই দশমিক পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে রয়েছে। এই সূর্যের থেকেও লক্ষ কোটি গুণ উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসার উর্ধ্ব জগতে বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের পরিমাপে সূর্য অত্যন্ত নগণ্য প্রকৃতির নক্ষত্র যার উজ্জ্বলতাও অত্যন্ত নগণ্য। সূর্যের থেকেও পঞ্চাশ গুণ বড় এবং চল্লিশ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন, 'ইটা ক্যারিনা'। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে এবং নিত্য নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের এক একটি গ্যালাক্সির ভেতরে সূর্যের থেকেও বিশাল আকৃতির অগণিত নক্ষত্র প্রবেশ করার পরও অসংখ্য জায়গা শূন্য রয়ে যাবে। সূর্যের চেয়ে বিশালাকৃতির আরেকটি তারকার নাম হলো 'বেটলজিয়ুজ'। এই বেটলজিয়ুজ নক্ষত্রের মধ্যে বর্তমান সূর্যের মতো পঞ্চাশ কোটি সূর্য অবস্থান করতে পারে।

এ ধরনের অসংখ্য নক্ষত্র আল্লাহ তা'য়ালা গ্যালাক্সির ভেতরে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল তারকা উর্ধ্বাকাশে রয়েছে। এসব এক একটি তারকা একটির কাছ থেকে আরেকটি কত দূরে অবস্থিত? একটি তারকা থেকে আরেকটি তারকায় পৌঁছতে সহস্র সহস্র বিলিয়ন আলোকবর্ষের প্রয়োজন হবে। অথচ আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড় হলো সূর্য, আর এ ধরনের পঞ্চাশ কোটি সূর্যের থেকেও বড় হলো বেটলজিয়ুজ তারকা। বিজ্ঞানীগণ বলেন, সূর্য মহাকাশে সেকেনেণ্ড ১৫০ মাইল গতিতে যাত্রা করে এবং ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে সূর্যের একবার পূর্ণ পরিক্রমণ করতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। এই পরিক্রমণে চাঁদ, সূর্য বা অন্য কোনো গ্রহ-উপগ্রহ কেউ কারো কক্ষপথ পরিহার করে অন্যের পথে প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، ذٰلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ، لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

www.pathagar.com

সূর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহরই সুনির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি, (কক্ষ পরিক্রমণের সময় ছোট হতে হতে তা এক সময়) এমন (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে, যেন তা পুরনো খেজুরের একটি পাতলা ডাল। সূর্যের এ ক্ষমতা নেই যে সে চাঁদকে নাগালের মধ্যে পাবে- না রাত দিনকে অতিক্রম করে আগে চলে যেতে পারবে, (মূলত চাঁদ সুর্যসহ এরা প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলেছে। (সূরা ইয়াছিন- ৩৮- ৪০)

মহাকাশে সূর্যের পরিণতি

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে সূর্য হলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ২০ হাজার কোটি তারকার মধ্যে একটি মাঝারি মানের তারকা হলো সূর্য এবং এটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই সৌরজগৎ। সৌরজগতে যতো বস্তু আছে তার ৯৯ দশমিক ৮৫ ভাগই রয়েছে সূর্যের দখলে। সৌরজগতের ভেতরের দিকের গ্রহগুলোকে বলা হয় ইনার প্লানেট এবং তুলনামূলকভাবে এরা আয়তনে ছোট। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের প্রভাব বলয় বিশাল এবং এই প্রভাব বলয়ভুক্ত অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে হেলিওস্ফেয়ার। আর এর সীমান্ত রেখাকে বলা হয় হোলিওপজ। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে সূর্য থেকে হোলিওপজ-এর দুরত্ব ১শ' এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা জ্যোতির্বিদ্যা একক। ১ এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সমান ১৫ কোটি কিলোমিটার বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকেই এক জ্যোতির্বিদ্যা একক বলা হয়।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কয়েকটি সর্পিল বাহু রয়েছে। তেমনই একটি বাহুতে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান। সৌরজগৎ অবস্থান করছে মিল্কিওয়ের নিরক্ষীয় তল থেকে ২০ আলোকবর্ষ ওপরের দিকে। আর গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে সৌরজগতের দুরত্ব ২৮ হাজার আলোকবর্ষ। সূর্য আকাশের বুকে জ্বলন্ত এক অগ্নিকুন্ড। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভেতরে দান করেছেন বিপুল শক্তি, বিশাল আয়তন আর তীব্র গতি। এ কারণে সূর্য লাভ করেছে এক মহাদানবীয় মর্যাদা। এই সূর্য ভয়ঙ্কর উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে আর সেই অগ্নিস্নানে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে বিশাল একটি জগৎ বিকাশ আর সমৃদ্ধির বিস্ময়কর সোপানে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে সূর্য তাপের কারণেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু সজীব রয়েছে। সূর্য মানেই জীবন ও সৃষ্টির উৎস। সূর্যহীনতায় এই সমৃদ্ধজগৎ পরিণত হবে প্রাণের স্পন্দনহীন এক মহাঅন্ধকার জগতে।

www.pathagar.com

মহাজগতের বিচারে সূর্য এক অতি তুচ্ছ একটি তারকা। কারণ এর থেকে কয়েক কোটি গুণ বিশালাকৃতির সূর্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য গ্যালাক্সির ভেতরে এবং বর্তমান দৃশ্যমান সূর্যের মতো তিনকোটি সূর্যকে ঐসব সূর্য চুষে খেয়ে হজম করার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য যে শক্তি ব্যয় করা হয়েছে, বর্তমান সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সেই শক্তি ব্যয় করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নির্গত হয়। এই গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতো তাহলে সমগ্র পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে–কোন এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেন সৃষ্টিজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সৌর জগতের মোট ভরের ৯৯. ৮৫ শতাংশই সূর্যের। সূর্যের ভর হলো আমাদের পৃথিবীর ভরের ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শ' গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার। সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৮০০ ডিগ্রি কেলভিন এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ কেলভিন। বিশাল সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশের বেশি ভর হচ্ছে সূর্যের। সূর্যের মোট ভরের ৭৫ শতাংশ হলো হাইড্রোজেন এবং বাকি ২৫ শতাংশ হিলিয়াম। সূর্যের মোট অণুর সংখ্যা হিসাব করলে এর ৯২ দশমিক ১ শতাংশ হলো হিলায়াম। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া আরেকটু ভারী পদার্থের পরিমাণ সূর্যে দশমিক ১ শতাংশ। সূর্য অবিরত মিল্কিওয়ের কেন্দ্রকে যেমন প্রদক্ষিণ করে চলেছে তেমনি নিজেও অবিরাম নিজ অক্ষে লাটিমের মতোই ঘুরছে।

প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে ৩৮৬ বিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। এই পরিমাণ হাইড্রোজেন পুড়ে উৎপন্ন হয় ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন হিলিয়াম এবং গামারে'র আকারে ৫০ লক্ষ টন শক্তি। উৎপাদিত এই শক্তি কেন্দ্র ছেড়ে যতই বাইরে দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে ততই সেই শক্তি মহান আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থার কারণে শোষিত হতে থাকে এবং তা থেকে বিকীর্ণ তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। সূর্যের বাইরের দিককে বা পৃষ্ঠদেশকে বলে ফটোস্ফিয়ার। এই এলাকার তাপমাত্রা ৫ হাজার ৮ শ' কেলভিন। গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০, ০০০ আলোকবর্ষ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সূর্য ছায়াপথের নিজস্ব সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৫৬ মাইল বেগে ধাবিত হচ্ছে। সূর্যের এই প্রচন্ড গতিই তাকে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্য তার সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি এক সময় শেষ করে ফেলবে এবং ক্রমশঃ তা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সূর্যের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। এক সময় তার গতি থাকবে না, তেজ থাকবে না, তখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই সূর্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে লাল দানবে (Red giant)। নক্ষত্রের বিলয় প্রক্রিয়ায় এই লাল দানবের অভ্যন্তরে জ্বালানি সংকট, অভিকর্ষ বলের প্রভাব তখন কার্যকর হবে ধ্বংস পতন ঘটিয়ে। এই ধ্বংস পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে চাপজনিত কারণে পরিণামে সৃষ্টি হবে একটি সাদা বামন। শীতল, অনুজ্জ্বল, নির্জীব ও অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন সূর্য সাদা বামনাকৃতি লাভ করবে, তখন তা মহাজাগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে এবং তখনই সূর্য চিরতরে হারিয়ে যাবে মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

এই অবস্থার দিকেই নির্দেশ করে আল্লাহর কোরআন বলছে, সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে অর্থাৎ সূর্যকে এমন অবস্থায় উপনীত করা হবে যে, তার আলো ও উত্তাপ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সূর্যে আলো এবং উত্তাপ থাকবে না ফলে এই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দনও থাকবে না, কোন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে না, নদী-সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘমালায় পরিণত হবে না, বৃষ্টি বর্ষণও হবে না। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সৃষ্টির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসবে। সূর্যের মতই অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা পুঞ্জের অভ্যন্তরে যে জ্বালানি শক্তি রয়েছে এবং যার কারণে তা উজ্জ্বল দেখায়, এসব জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় তা অন্ধকারের বিবরে হারিয়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে বর্তমানে যে যার অবস্থানে রয়েছে। সেদিন মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে। তখন সকল কিছুই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

মহাকাশে ব্লাকহোল

এসব তারকার থেকেও বিশাল দানব আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিজ্ঞানীগণ সেগুলোর নাম দিয়েছেন 'ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ'। এই ব্লাকহোল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ–

শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমরা যদি জানতে তা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ। (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫-৭৬)

এই ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ এক অদৃশ্য দানবীয় শক্তি। নক্ষত্র তা যতো বড়ই হোক না কেন, পরিভ্রমণ করতে করতে তা এই ব্লাকহোলের রেঞ্জের মধ্যে বা আওতায় এসে

www.pathagar.com

গেলে, এমনভাবে শোষণ করে নেয় যে, তার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্লাকহোল মহাশূন্যে দু'একটি নয়, আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য ব্লাকহোল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেন, আমাদের এই পৃথিবী কোনভাবে যদি ব্লাকহোলের আওতায় এসে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের ভেতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ব্লাকহোল এই বিশাল পৃথিবীকে সংকুচিত করে এমন এক ক্ষুদে পিন্ডে পরিণত করবে যে, এর ব্যাসার্ধ হবে মাত্র এক সেন্টিমিটার। এই সৌরজগতের আয়তনের সমান একটি ব্লাকহোল শত লক্ষ কোটি সূর্যকে মুহূর্তে সংকুচিত করে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

মহাকাশে কোয়াসার

মহাকাশের রহস্যময় আবেগদীপ্ত জ্যোতিষ্কের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন 'কোয়াসার'। এই কেয়াসারের আলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়েছে। অথচ সৌরজগতের সবচেয়ে কাছের কোয়াসার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময়ের প্রয়োজন হয় দেড় শতকোটি বছর। আর দূরতম কোয়াসার থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌছতে সময়ের প্রয়োজন হবে এক হাজার কোটি বছর। বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছেন, বর্তমান পৃথিবীর বয়স হলো চারশত ষাট কোটি বছর। তাহলে দূরতম কোয়াসার পৃথিবীতে পৌছবে আরো পাঁচশত কোটি বছর পরে। এই বিশাল ও উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসারের সংখ্যা মহাকাশে অগণিত। এক একটি ধুমকেতুর কাছে ঐ বিশালাকের সূর্য ছোট্ট একটি বালুকণার মতো। সৃষ্টির শুরু থেকে এসব বিশাল আকৃতির জগৎ সেকেন্ডে শতকোটি কিলোমিটার গতিতে বিরামহীনভাবে একদিকে ছুটে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে ছুটতেই থাকবে, ধ্বংস না পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। তবুও তা গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ অসংখ্য সৃষ্টিজগতের রব। শুধুমাত্র তিনি মহাকাশেই কত বিশাল জায়গা সৃষ্টি করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

আদিতে আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল

বিজ্ঞানীদের ধারণানুসারে আমাদের এ মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ হতে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে প্রচণ্ড ঘনায়নকৃত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঈধথ ঈটতথ নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ-

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (একে অপরের সাথে) পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমি তাদের পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে আমি সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তারপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (সূরা আম্বিয়া- ৩০)

Big Bang বিন্দু হতে পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপ অতিক্রম করার পর 'শক্তি' পদার্থ কণার ধুঁয়ার অস্তিত্ব লাভ করে এবং মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত হয়ে নবীন মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যা পরবর্তীতে 'নেবুলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ اْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ–

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো-ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা এলাম অনুগত হয়ে। (হা-মীম সাজদা-১১)
মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন–

هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ–

তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। (সূরা মু'মিন-১৩)

শত-সহস্র লক্ষ মাইল ব্যাসের নক্ষত্রসমূহ মহাকাশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উত্তপ্ত ধূলা-বালি, অগ্নিশিখা ও মৌলিক পদার্থের গলিত মিশ্রণ দিয়ে শত–শত আলোকবর্ষ এলাকা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বিজ্ঞান এ ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশ জয় করার জ্ঞান এখনও লাভ করতে পারেনি।

বহুমাত্রিক জগতের ধারণা

সাধারণতঃ মানুষ এই পৃথিবীকেই প্রথম ও শেষস্থল বলে জানতো। এরপর মানুষ ধারণা লাভ করলো মানুষের জীবনাবসানের পরে পরলোক বলে আরেকটি জগৎ রয়েছে। কোরআনে বর্ণিত বহুমাত্রিক জগতের ধারণা পেয়ে চিন্তাশীল মানুষ যখন গবেষণা করেছে তখন তারা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'আলামীন' শব্দের রহস্য উদ্ঘাটন করতে কিছুটা সমর্থ হয়েছে। সূরা ফাতিহা আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

www.pathagar.com

জাগে, আমরা চোখের সামনে জগৎ দেখছি মাত্র একটি এবং পৃথিবী নামক এই জগতে আমরা বসবাস করছি। অন্য জগতগুলো কোথায়? সাধারণভাবে চিন্তা করলেই কোরআনে বর্ণিত বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

মহাশূন্যে কতটি জগৎ রয়েছে, সে আলোচনা মুলতবী রেখে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের নীচে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান। মাটির নানা স্তর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। অসংখ্য খনিজজগৎ মাটির নীচে সৃষ্টি করেছেন। খনিজ পদার্থসমূহ মাটির নীচের জগতেই অবস্থান করছে। পানির জগৎ রয়েছে মাটির নীচে। মাটির নীচে এমন ধরনের জগৎ বিদ্যমান রয়েছে যে, প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে গলিত উত্তপ্ত লাভা আলোড়িত হচ্ছে। মাঝে মাঝে তা জ্বালামুখ দীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে আঘাত হানছে। কোথাও রয়েছে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি। ফুটন্ত প্রসবণ, ঝর্ণার আকারে তা নির্গত হয়ে থাকে।

সমুদ্র গর্ভে রয়েছে আরেকটি জগৎ। অগণিত প্রাণী সেখানে বসবাস করছে। সমুদ্রের অতল তলদেশে রয়েছে উদ্ভিদজগৎ। এরও নীচে রয়েছে উত্তপ্ত লাভার জগৎ। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে মরুজগৎ, অরণ্যজগৎ, পশুজগৎ। দৃশ্যমান জগতেরই কোন শেষ সীমা নেই, এরপরেও রয়েছে অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু জগতও সম্পূর্ণ একটি অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু বা এ্যাটম–একে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত দেখতে সক্ষম নই। এটা কেন দেখা যায় না এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের দেখার বা চোখের ক্ষমতা কতটুকু।

যখন আমরা কোন বস্তুকে দর্শন করি, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ ছড়িয়ে পরে এবং তা আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। আলোক তরঙ্গের বিচ্ছুরণ ব্যতীত কোন কিছুই আমরা দেখতে পাই না। যখন কোন আলোক তরঙ্গ কোন জিনিসের ওপরে পতিত হয়ে বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলে তখন আলোক তরঙ্গ আর ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে না। সুতরাং, কোন বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হবার শর্ত হলো, বস্তুতে পতিত আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হতে হবে।

এবার আসা যাক পরমাণু সম্পর্কিত ব্যাপারে। পরমাণু দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ছোট। এ কারণে আলোক তরঙ্গ যখন তার ওপর পতিত হয় তখন তা সম্পূর্ণ পরমাণুকে পরিপূর্ণভাবে আবৃত করে ফেলে। যে কারণে আর তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না। এই কারণেই আমরা পরমাণু খালি চোখে দেখতে পাই না।

www.pathagar.com

এভাবে যদি কয়েক লক্ষ পরমাণু মানুষের চোখের সামনে রাখা হয়, তবুও তা মানুষের দৃষ্টি দেখতে সক্ষম হবে না। মানুষের দৃষ্টি যা দেখতে সম্পূর্ণ অক্ষম অথচ এই পরমাণুরে ভেতরে আল্লাহ তা'য়ালা আরেকটি শক্তিশালী জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই জগতকেই বলা হয় পরমাণু জগৎ। মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ভাঙলে পাওয়া যায় ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লী, কোয়ার্ক এবং আরো কত কিছু। এ ধরনের বহু অণুকণা ও প্রতিকণা অদৃশ্য জগতে বিরাজ করছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে এসব কণা দর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হচ্ছে। এসব রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ভেদন শক্তি সম্পন্ন; এসব নিউক্লিয়াসকে ভেঙে প্রতি মুহূর্তে নির্গত হয়। এ ধরনের আরো অদৃশ্য রশ্মি সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান এবং যা খালি চোখে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অদৃশ্যজগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের পরিবেশকে বেষ্টন করে আছে। এসব এককোষী প্রাণীর মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে, ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, মানুষ যে সৌরজগতে বসবাস করছে এবং তার দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান যে জগত বিদ্যমান এটাই শেষ নয়। এ ধরনের অসংখ্য সৌরজগৎ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতি চার বিলিয়ন মানুষ যদি একটি করে সৌরজগতে অবস্থান করে, এরপরেও সহস্র বিলিয়িন তথা অসংখ্য সৌরজগৎ ফাঁকা থেকে যাবে। এত সৌরজগৎ মহান আল্লাহ মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন। মহাশূন্য যে কত বিশাল তা কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে আবিষ্কার করা তো দূরের কথা, এর বিশালতা সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারেনি। মহাশূন্যে রয়েছে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য, তারকাপুঞ্জ, গ্রহ-উপগ্রহ, মিল্কীওয়ে, গ্যালাক্সী এবং ব্লাকহোল। এসবের পরিধি এবং বিশালতা দেখে বিজ্ঞানীগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা যে বিশলতা দিয়ে মহাশূন্য নির্মাণ করেছেন সে তুলনায় এই পৃথিবী একটি ছোট্ট মার্বেলের সমানও নয়। মহাজগতের বিবেচনায় বর্তমানে মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগতটি নিতান্তই ক্ষুদ এবং অতি তুচ্ছ একটি অঞ্চল। বিশাল মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানি যেমন, মহাবিশ্বে এই সৌরজগতের অবস্থান ঠিক তেমনি। স্বয়ং পৃথিবীর অবস্থা যদি ছোট্ট একটি মার্বেলের মতো হয় তাহলে ক্ষমতাদর্পী এই মানুষের অবস্থান কোথায়? মহাশূন্যের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকার মতও নয়। অতএব অস্তিত্বহীন শক্তি আর ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়ে মানুষের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা চরম

www.pathagar.com

বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। এ জন্য পৃথিবীর বর্তমানে যারা বিখ্যাত বিজ্ঞানী তারা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। মহাশূন্যের সৃষ্টিসমূহ আর বিশালতা দর্শন করে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

দিন-রাতের আবর্তন ও বিবর্তন

আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করছে–

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، ذٰلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

এদের জন্য রাত হচ্ছে আরেকটি নিদর্শন। আমি তার ওপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্তিত হিসাব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মন্‌যিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শূকনো শাখার মতো হয়ে যায়। না সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা রয়েছে দিনকে অতিক্রম করতে পারে, এসব কিছুই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সন্তরণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৩৭-৪০)

পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিবাবসান ও রাতের আগমন ঘটতে পারে না। দিবাবসান ও রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার যে গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট প্রাণীকুলের সাথে পরিলক্ষিত হয় তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন বিজ্ঞ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে অনুগ্রহ করে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব, পানি ও বাতাসের অস্তিত্ব এবং নানা ধরনের খনিজ সম্পদের অস্তিত্বও প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করানোর এবং তারপর পৃথিবীর নানা অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফসল।

www.pathagar.com

যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে একটু কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে প্রতি মুহূর্তে রাত ও অন্য অংশে দিন অবস্থান করতো অথবা দিন-রাতের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত বা খুবই কম গতিসম্পন্ন হতো অথবা নিয়ম অনুসারে না ঘটে হঠাৎ কখনো দিন বা রাতের আগমন ঘটতো, তাহলে পৃথিবী কোন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থা যদি হতো তাহলে পৃথিবীর নিষ্প্রাণ জড় পদার্থসমূহের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্ন আকৃতির হতো।

এসব দেখে কোন মানুষ যদি একেবারে মূর্খ না হয় এবং অন্তরের চোখ বন্ধ করে না রাখে, তাহলে সে মানুষ এসব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে, যিনি এই পৃথিবীর বুকে এই বিশেষ ধরনের সৃষ্ট প্রাণী জগতকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছে করেন এবং সৃষ্টির যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন স্থাপন করেন। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তথা তাওহীদ যারা মানতে অস্বীকার করে তারা এ কথা বলুক যে, সৃষ্টিজগতের এই বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ কয়েকজন স্রষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা কতটা মূর্খতার পরিচয় বহন করে?

রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে, এখানে অন্য কারো আধিপত্য বিস্তারের সামান্যতম সুযোগ নেই। রাত আর দিনের ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সমস্ত সৃষ্টির জন্য তা উপকারী হওয়া এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, একমাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে এমনভাবে এই ব্যবস্থা চালু করেছেন যেন তাঁর সৃষ্টির জন্য সমস্ত কিছুই কল্যাণকর হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ–

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের পরিবেশে আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না। (সূরা আল মু'মিন-৬১)

www.pathagar.com

ভূগোল সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান রয়েছে তারাও এ কথা জানে যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহের দুটো গতি রয়েছে এবং তার একটি নাম হলো আহ্নিক গতি ও অপরটির নাম হলো বার্ষিক গতি। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের এই পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার ঘুরে আসে। আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরছে এবং এ কারণে দিন রাতের আবর্তন ও বিবর্তন হচ্ছে। এই কক্ষগতির সাথে অক্ষগতির একটা সুসামঞ্জস্য রয়েছে বলেই দিন, রাত ও ঋতুর আবর্তন হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অক্ষগতির সঠিক কারণ কি এবং তার উৎস কোথায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান শুধুমাত্র অনুমানলব্ধ। সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন রাত আবর্তনকারী এই আহ্নিক গতি একটি মহাবিস্ময়কর বিষয়।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, ধনীগণ, বিত্তশালীগণ, প্রচন্ড ক্ষমতাধর, শক্তির নিরিখে কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আকাশমন্ডলের প্রসঙ্গে উক্ত শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী। সুতরাং এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুর থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্ত কাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না এবং যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের অস্তিত্বই থাকতো না।

মহাবিশ্ব কি নিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মানুষের জানা নেই। বিজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে যতটুকু জানতে পেরেছেন, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আমরা খালি চোখে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের যে অবস্থা দেখতে পাই, এর থেকে কয়েক শত কোটিগুণ বিশাল হলো এই মহাবিশ্ব। মানুষ ধারণা করতো রাতের দৃশ্য অসীম আকাশই হলো মহাবিশ্ব জগৎ। কিন্তু মাত্র কিছুদিন

www.pathagar.com

পূর্বে বিজ্ঞানীগণ দেখতে পেলেন, দৃশ্য জগতের অগণিত অযুত নক্ষত্রমালা শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি যা পৃথিবীর ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মানে হলো দৃশ্যমান নিকটতম প্রতিবেশী, যা আমাদের থেকে প্রায় ২২ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরের আর বিপুল বিরাট জগৎ, নক্ষত্র ধারণ ক্ষমতায় যা ছায়াপথের তিনগুণ এবং বিশাল জগতটিও লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূর-দূরান্তে অবস্থিত একশত কোটির মধ্যে একটি সামান্য গ্যালাক্সি মাত্র। এই আলোক বর্ষের হিসাবটি কি! আমাদের জানা আছে যে, আলো প্রতি মুহূর্তে ১, ৮৬, ০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তথা আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সুতরাং আলোর এক মিনিটে অতিক্রমযোগ্য দূরত্ব হলো তার ৬০ গুণ। তাহলে ঘন্টায় বৃদ্ধি পায় আরো ৬০ গুণ। দিনে বৃদ্ধি পায় আরো ২৪ গুণ। বছরে বৃদ্ধি পায় ৩৬৫, ২৫ গুণ। যার দূরত্বের দৈর্ঘ্য হলো কমবেশী ৫, ৮৬৯, ৭১৩, ৬০০, ০০০ মাইল। এর নাম হলো আলোক বর্ষ আর এই হিসাবে পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার ব্যাস হলো ১০০, ০০০ গুণ বা ৫৮৬, ৯৭১, ৩৬০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল–যা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। এটা হলো সেই গ্যালাক্সির মাপ বলেছেন বিজ্ঞানীরা, যেটায় এই পৃথিবী অবস্থান করছে। আর এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বড় গ্যালাক্সি রয়েছে ঊর্ধ্ব আকাশে এবং এ ধরনের অতিকায় গ্যালাক্সির সংখ্যা যে কত কোটি, তা বিজ্ঞানীরা আজো জানে না।

আর এসব গ্যালাক্সি একটির থেকে আরেকটি ১৬০, ০০০ থেকে ১০, ০০০, ০০০, ০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থান করছে এবং যার যার দূরত্ব ঠিক রেখে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতিতে ধাবিত হচ্ছে। এই পৃথিবী যে গ্যালাক্সি গুচ্ছে অবস্থান করছে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে এই গ্যালাক্সির সংখ্যা হলো মাত্র ২০টি। আর পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব বিশাল গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন, সেসব গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মহাসমুদ্রে এক একটি বিশাল জগৎ, যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। এসব গ্যালাক্সি বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। এসব গ্যালাক্সির সামনে আমাদের দৃশ্যমান এই বিশাল জগৎ ক্ষুদ্র একটি বালু কণার সমানও নয়। পৃথিবীর ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে এক অতি সাধারণ দীন হীন গ্যালাক্সি, অনন্ত ঐ মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই।

বর্তমানের বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের মাত্র ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের কোয়াসারকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরত্বের ওপারে ঐ মহাশূন্যে আরো কত বিশাল জগৎ যে রয়েছে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণাই নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতদিন

www.pathagar.com

মানুষ যাকে বিশ্বজগৎ বলে মনে করেছে, এই বিশ্বজগতের সমান এবং এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বিশাল জগতের সংখ্যা ঐ মহাশূন্যে ১০০ কোটির বেশী। তারা বলছেন, ঐ এক একটি জগতের মধ্যে রয়েছে কল্পনার অতীত অগণিত বিশাল ছায়াপথ, এসব ছায়াপথে রয়েছে অকল্পনীয় সংখ্যক সূর্য, তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি।

এসব কিছুই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই পৃথিবী এবং গ্যালাক্সি কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহু প্রতি মুহূর্তে ৫৩ কিলোমিটার বেগে এবং বিপরীত বাহু প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। একই পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে ২০০০ আলোক বর্ষ ব্যাসের গ্যালাক্সি কেন্দ্রও প্রতি সেকেন্ডে ৪০ কিলোমিটার গতিতে। আর এই সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সির ভেতরে, বাইরে ও গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। একটি গ্যালাক্সি থেকে আরেকটি গ্যালাক্সির দূরত্ব শত কোটি আলোক বর্ষ এবং এই দূরত্বের মাঝে রয়েছে আরো অগণিত বস্তু। কোন কোন গ্যালাক্সি আলোর গতিতে এক অজানা পথে সৃষ্টির শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। মানুষ বিজ্ঞানীরা ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষের ওপারে কোন গ্যালাক্সি চলে গেলে আর দেখতে পান না।

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, প্রতি মুহূর্তে কত শতকোটি গ্যালাক্সি কোথায় কোন দূর অজানায় হারিয়ে গিয়েছে, তার সন্ধান একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। ১১, ০০০ মিলিয়ন দূরের গ্যালাক্সির সন্ধান বিজ্ঞানীদের জানা নেই এবং এই দূরত্বের পরে আর কি রয়েছে, তাও তাদের জানা নেই। আর এসবের কত ওপরে যে আকাশ রয়েছে, তা বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আকাশ সম্পর্কে তারা কিভাবে ধারণা দেবে! মহাকাশের এতকিছু নিয়ে গোটা মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এ অবস্থায় যখন তা শেষ সীমানায় পৌঁছে যাবে, তখন ঐ মহাকাশ বেলুনের মতই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ছোট্ট একটি কথায় এই মহাবিশ্বের আকৃতি তুলনা করা যায় এভাবে যে, বিজ্ঞানীগণ এই পৃথিবী ও পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের দিকে ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের যে মহাবিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, তা গোটা বিশ্বের সমস্ত বালু কণার তুলনায় একটি মাত্র বালুকণার সমান। সমস্ত কিছুই এক অবিশ্বাস্য গতিতে এক অজানা পথে কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন, আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে–সেদিকেই মহাবিশ্ব ধাবমান। অথচ এই একই কথা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনে জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন সেদিন তারকাসমূহ এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিভাবে তা পড়বে, বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে তীব্র গতিতে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এই আকর্ষণী শক্তিকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন (Gravitational Force) বা মহাকর্ষীয় শক্তি। সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ সূর্যের আকর্ষণে আবর্তিত হয়ে থাকে আবার উপগ্রহগুলো গ্রহের আকর্ষণে আবর্তিত হয়। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে দলবদ্ধভাবে পরিক্রমণ করে। এভাবে একক গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির আকর্ষণে আবর্তিত হয়। এভাবে করে প্রতিটি বস্তুই একে অপরের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে এই মিলন ঘটতে না পারার কারণ হলো মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (Force of Expansion.)। এই গতির ফলেই পরস্পরের মধ্যে Space সৃষ্টি হয় এবং দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সম্প্রসারণ গতি একদিন হরণ করবেন। বিজ্ঞানীগণও বলছেন, সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে। তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের কাছে তাদের অকল্পনীয় গতি নিয়ে। ফলে একটির সাথে আরেকটির মহাসংঘর্ষ ঘটবে। তখন সমস্ত নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। মহাকর্ষ শক্তি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (Expansion) স্তব্ধ করে দেবে মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব সৃষ্টি করে। মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব এক সময় এত অধিক বৃদ্ধি লাভ করবে যে, তখন মহাকর্ষ শাক্তি অধিক পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করে মহাসংকোচের দিকে নিয়ে যাবে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন Big Crunch.

অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের সূরা দুখানে যেমন বলা হয়েছে, আদিতে সমস্ত কিছুই একটি বিন্দুতে ধূমায়িত ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা তা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করেছেন, তেমনি Big Crunch-এর মাধ্যমে পুনরায় মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, মহাকাশে নতুন নতুন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই কারণে মহাজাগতিক গড় ঘনত্ব প্রভাবিত হচ্ছে। আবার মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর ভেতর ১০ কোটি Neutrino রয়েছে। এর পরিমাণও বিশাল ভরে সমৃদ্ধ এবং তাদের মোট ওজন মহাবিশ্ব closed করার জন্য যথেষ্ট।

এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলি (Cosmic Dust) মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি করছে। যেমন প্রতি বছর ১০ হাজার টন ধূলি কণা শুধু পৃথিবী গ্রহে পতিত হয়। এরপরে রয়েছে মহাকাশে রয়েছে কৃষ্ণ বিবর (Black Hole)। বিজ্ঞানীদের ধারণা

www.pathagar.com

মহাকর্ষের আকর্ষণে নক্ষত্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হলেই সংঘর্ষ হয় তখন Black Hole-এর সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রমন্ডলী তীব্র আকর্ষের কারণে একে অপরের দিকে আলোর গতিতে ছুটে আসতে থাকবে। তখন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে এবং তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

সম্প্রসারণশীল মহাজগৎ

কোরআন বলেছে, এই জগতের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে-বিজ্ঞান এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়েছে। কোরআন বলেছে, এই সৃষ্টিজগৎ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে-বিজ্ঞান অনেক জল ঘোলা করে তারপর এ কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে যে, সত্যই-মহাশূন্যে সমস্ত কিছু সম্প্রসারিত হচ্ছে। একটি গ্যালাক্সি আরেকটি গ্যালাক্সির কাছ থেকে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার বেগে অজানার পথে সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। কোথায় যে এর পরিসমাপ্তি-তা বিজ্ঞান অনুমান করতে যেমন পারছে না, তেমনি অনুমান করতে পারছে না, মহাশূন্য কতটা বিশাল। এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার একদিন সমাপ্তি ঘটবে, তখন শুরু হবে আবার সংকোচন প্রক্রিয়া। মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই যে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

আমি আকাশ মন্ডলীকে নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর একে আমি সম্প্রসারিত করছি। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ একসাথে অনেকগুলো গ্যালাক্সির ওপরে গবেষণা করে দেখেছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটা কেমন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটি একটি অন্যটির সমান্তরাল নয়। তারা ধারণা করেন, একটি গ্যালাক্সি অন্য আরেকটি গ্যালাক্সি অথবা একাধিক গ্যালাক্সি ক্রমশঃ দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। বিষয়টিকে তারা সহজবোধ্য করার জন্য বেলুনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বেলুনে বাতাস দিতে থাকলে তা যেমন ক্রমশঃ ফুলতেই থাকে, তারপর এক সময় ফেটে যায় এবং রাবারের টুকরোগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে। বেলুন ফুলতে থাকাবস্থায় তার ভেতরের স্থান যেমন সম্প্রসারিত হতে থাকে, তেমনি এই মহাশূন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। নক্ষত্রসমূহ কোনো গ্যালাক্সি ব্যবস্থার পরিমন্ডলে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি এই মহাবিশ্ব প্রতি মুহূর্তে প্রবল গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

পৃথিবী এবং গ্যালাক্সী কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে তিপ্পান্ন কিলোমিটার বেগে এবং তার বিপরীত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে একশত পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কোন গ্যালাক্সি সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল বেগে, কোনটি সেকেন্ডে নব্বই হাজার মাইল বেগে আবার কোনটি সেকেন্ডে আলোর গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গ্যালাক্সিসমূহের পশ্চাদপসরণ

সৃষ্টির আদি থেকেই এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে। কোথায় যে এরা ছুটে যাচ্ছে, তা বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। এই গ্যালাক্সিগুলো একটি আরেকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে না। তারা একেবারে সোজা পিছে সরে যাচ্ছে। মহাকর্ষ বলের কারণে প্রতিটি গ্যালাক্সি একে অপরকে আকর্ষণ করে। এরপরও তারা পরস্পরের কাছে ছুটে আসতে পারে না। কারণ গোটা মহাবিশ্ব ব্যাপী একটি সম্প্রসারণ বল সক্রিয় রয়েছে। এই বল এখনো মহাকর্ষ বলের থেকে অনেক বেশী এবং এ কারণেই মহাবিশ্ব সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু মহাকর্ষ বল প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছে গ্যালাক্সিগুলোকে পরস্পরের দিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। এই মহাকর্ষ বলের কারণেই ক্রমশঃ একদিন গ্যালাক্সিগুলোর পশ্চাদপসরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক কথায় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ মতামত দিচ্ছেন।

তারপর মহার্কষ বলের কারণেই গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে শুরু করবে আর এভাবেই শুরু হবে মহাবিশ্বের সংকোচন প্রক্রিয়া। ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্ব কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকবে, সময় যতই অতিবাহিত হবে, গ্যালাক্সিগুলোর পরস্পরের প্রতি ছুটে আসার গতি ততই বৃদ্ধি লাভ করবে। এভাবে এক সময় সমস্ত গ্যালাক্সি তাদের যাবতীয় পদার্থ তথা নক্ষত্র, উন্মুক্ত গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদিসহ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পরস্পরের ওপরে পতিত হবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, সংকোচনের শেষ পর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় পদার্থ, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র পিন্ডে পরিণত হবে। সমাপ্তিতে সৃষ্টি জগতের এই একত্রিত অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বিগ্ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

পৃথিবীর ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যত তথা পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখিত ধারণা পোষণ করছে বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ। তারা বলছেন, তাপের উৎস হলো সূর্য। আর এই তাপের কারণেই গোটা সৃষ্টিজগৎ সচল রয়েছে। অথচ এই সূর্য ক্রমশঃ তার জ্বালানি শক্তি

www.pathagar.com

নিঃশেষ করে ফেলছে। অর্থাৎ সূর্য একটি পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ، مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى–

তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করেনি? আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক ও উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রূম-৮)

এই পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অনাদি ও অনন্ত নয়, এ কথা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টির সামনেই মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, পুরাতনের স্থানে নতুনের আগমন ঘটছে। কিন্তু এর একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিভাবে–কি করে ঘটবে তা গবেষকদের কাছে আর অনাবৃত নেই।

সৃষ্টি জগতের নির্দিষ্ট পরিণতি

সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম বিষয় বলা হলো, কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি হয়নি–সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এরপর মানব জাতির সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে, এসব সৃষ্টি নশ্বর না অবিনশ্বর? এ প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য চিন্তাবিদ ও গবষেকগণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন সৃষ্টিসমূহের প্রতি। তারা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এখানে কোন জিনিসই অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি জিনিসেরই একটি নির্ধারিত জীবনকাল নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সেই প্রান্ত সীমায় পৌঁছানোর পরে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টি জগতসমূহও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আজ বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তারা বলছেন, এখানে দৃশ্যমান–অদৃশ্যমান যতগুলো শক্তি সক্রিয় রয়েছে তারা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ পরিসরে তারা কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে। তারপর কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

www.pathagar.com

সুদূর অতীতকালে যেসব চিন্তাবিদগণ পৃথিবীকে আদি ও চিরন্তন বলে ধারণা পেশ করেছিলেন, তাদরে বক্তব্য তবুও সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি লাভ করতো। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে এ কথা বলার আর কোন অবকাশ নেই যে, এই পৃথিবী আদি ও অবিনশ্বর। কোনদিন এই জগৎ ধ্বংস হবে না, নাস্তিক্যবাদীদের জন্য এ কথা বলার মতো কোন সুযোগ বিজ্ঞানীগণ আর রাখেননি। তারা কোরআনের অনুসরণে স্পষ্টভাবে মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের সকল কিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে বস্তুবাদিরা এ ধারণা প্রচলন করেছিল যে, বস্তুর কোন ক্ষয় নেই–বস্তু কোনদিন ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে মাত্র। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনের পর বস্তু–বস্তুই থেকে থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা প্রচার করতো যে, এই বস্তু জগতের কোন আদি-অন্ত নেই। সমস্ত কিছুই অবিনশ্বর। কোন কিছুই চিরতরে লয় প্রাপ্ত হবে না।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আনবিক শক্তি আবিষ্কৃত হবার পরে বস্তুবাদীদের ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বলছেন, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই বস্তুর শেষ স্তরে এর কোন আকৃতিও থাকে না এবং এর কোন ভৌতিক অবস্থানও বজায় থাকে না। তারপর Second law of thermo-Dynamics এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই বস্তুজগৎ অবিনশ্বর নয়, এটা অনন্ত নয় এবং তা হতে পারে না। এই বস্তুজগৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে। কোরআন সপ্তম শতাব্দীতে যে ধারণা মানব জাতির সামনে পেশ করেছিল, বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ তা নতুন মোড়কে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করছে।

আবরণ দীর্ণ করেই নব সৃষ্টি

মানুষের মালিক মানুষ স্বয়ং নয়, তার মালিক হলেন আল্লাহ। এ জন্য তার অধিকার নেই যে, সে তার মালিককে অস্বীকার করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করে। তাঁর যে মালিক ও স্রষ্টা, তাঁরই দাসত্ব এবং

www.pathagar.com

যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ঘোষণা করছে–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ–

বলো, আমি আশ্রয় চাই রাব্বুল ফালাকের কাছে। (সূরা ফালাক–১)

সূরা ফালাক আল্লাহর কিতাবের ত্রিশ পারার ছোট্ট একটি সূরা। এ সূরাটি অধিকাংশ মুসলমানের মুখস্থ রয়েছে। নামাজে এটি বার বার পাঠ করা হয়। এ সূরার প্রথম আয়াতে ফালাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাথে রব শব্দ সহযোগে উচ্চারিত হয়েছে, 'রাব্বুল ফালাক'। রাব্বুল ফালাক কাকে বলা হয়–বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। আরবী ফালাক শব্দের ক্রিয়ামূল হলো 'ফুল্‌কু'। এর অর্থ হলো 'যে চিরে ফেলে।' আর ফালাক শব্দের অর্থ হলো, কোন কিছু দীর্ণ করা বা চিরে ফেলা। সূরা আল আন্‌আ'ম-এর ৯৬ আয়াতে 'ফলিকুল ইস্‌বাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনিই রাতের আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের উন্মেষ ঘটান।' আর সূরা ফালাকের প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'রাব্বুল ফালাক' শব্দের সরল অর্থ হলো, 'প্রভাত কালের রব'।

পৃথিবীতে এক একটি দেশে প্রভাত কিভাবে হয়? রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাত হওয়া বলে। অর্থাৎ অন্ধকারের বুকচিরে নবারুণের আগমন ঘটে। আর এই প্রক্রিয়াকে আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে, ফালাকুস্ সুবাহ্ অর্থাৎ প্রভাত সূর্যের উদয়। এই ফালাক শব্দের আরেকটি অর্থ করা হয়েছে 'সৃষ্টিকার্য সমাধা করা।' এই অর্থ এ জন্য করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত কিছুই সৃষ্টি হয়, তা কোন না কোন জিনিস বা আবরণ ভেদ করে, দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়। তিমিরাবৃত রজনীর বুকচিরেই দূর নিহারিকা কুঞ্জের মিটিমিটি আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌছায়। উত্তাল সাগরের বুক চিরেই জলযানসমূহ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। খেজুর গাছে সুমিষ্ট রসের ভান্ডার মওজুদ থাকলেও তা নির্গত হয় না। খেজুর গাছকে যখন দীর্ণ করা হয়, তখনই রস বেরিয়ে আসে। রাবার গাছসমূহ দীর্ণ করা না হলে রাবার পাওয়া যায় না। ডাবের পানি পান করতে হলেও তা দীর্ণ করতে হবে। পৃথিবীর উদ্ভিদ বীজসমূহ মাটির বুকচিরেই তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই পৃথিবীর আলো বাতাসে বেরিয়ে আসে।

ডিমের মাধ্যমে বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীতে যেসব প্রাণী ডিম দেয়, সেই ডিম দীর্ণ করেই শাবক পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে। কুমিরের মতো বিশাল প্রাণীর বাচ্চাও ডিম চিরেই ভূমিষ্ঠ হয়। নদী-সাগর-মহাসাগরে যেসব প্রকান্ড মাছ বাস

www.pathagar.com

করে, সেসব মাছের বাচ্চাও ডিম থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী মাতৃগর্ভ থেকে কোন বাধা বা আবরণ দীর্ণ করেই এই পৃথিবীতে আগমন করছে। বৃক্ষের বহিরাবরণ দীর্ণ করেই শাখায় শাখায় জাগে কিশলয়। ফুলের কুড়ি দীর্ণ করেই ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে পাঁপড়ী মেলে দেয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কোন না কোন বাধা অপসারিত করে, কোন কিছুর বুক চিরে বা কোন আবরণ দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়, আর এই প্রক্রিয়ায় যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন রাব্বুল ফালাক। তিনিই মানুষের মালিক, খালিক, সম্রাট, শাসক, আইনদাতা ও জীবন বিধানদাতা। একমাত্র তাঁরই সকল প্রশংসা এবং তিনিই দাসত্ব লাভের অধিকারী। কোরআনের গবেষকগণ এই ফালাক শব্দের বিস্তারিত তাফসীর করেছেন।

একই মোহনায় মিলন

পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মিলন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান এবং তা এক চিরন্তন শ্বাশত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে। প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুর মধ্যে। সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্য হলো, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে একই মোহনায় অবস্থান করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই সে মিলনের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিজগতের কোন একটি জিনিসও চিরন্তন এই নিয়ম ও পদ্ধতির বাইরে নয়। এর ব্যতিক্রম কোথাও দৃষ্টি গোচর হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ–

পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, তা যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, অথবা স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের সম্পর্কে মানুষ এখনো আদৌ কিছু জানে না। (সূরা ইয়াছিন- ৩৬)

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

প্রত্যেকটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে করে এ নিয়ে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পারো। (সূরা যারিয়াত- ৪৯)

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهرًا، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ–

তিনিই তোমাদের জন্যে এ যমীন বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বসিয়ে দিয়েছেন, সেখানে আরো রয়েছে রং বেরংয়ের ফল ফুল, তাও বানিয়েছেন আবার জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আর রা'দ-৩)

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّى، كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامُكُم، اِنَّ فِىْ ذلِكَ لايتٍ لاُولِى النُّهى–

তিনি এমন এক সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন, ওতে তোমাদের চলার জন্যে বহু ধরনের পথঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি প্রেরণ করেন, এরপর দিয়ে যমীন থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনেন। যেনো তোমরা তা নিজেরা খাও এবং তাতে তোমাদের পশুদেরও চরাতে পারো; অবশ্যই এর মধ্যে বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে শিক্ষার অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ত্বাহা- ৫৩-৫৪)

এই যে একই মোহনায় মিলন অবস্থান এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানবজাতি, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদরাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সুক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি জিনিসও এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমন কৌশলে রচিত ও সজ্জিত যে, এখানে সর্বত্রই পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতি। এ দুটো প্রজাতি সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান। এ দুটো প্রজাতির ভেতরে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে আকর্ষিত করছে। এ আকর্ষণের কারণেই মানুষের ভেতরে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিয়ের মাধ্যমে মিলিত জীবন-যাপন করে। সমস্ত প্রাণীজগতেও এ আকর্ষণ কার্যকর রয়েছে।

মানুষ এবং প্রাণীসমূহ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কারণে একের কাছে আরেকজন যেতে পারে এবং মিলিত হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদজগৎ তথা জড়জগতের অবস্থা ভিন্নরূপ। এসব সৃষ্টির সূচনাতে যে স্থানে অবস্থান করে, পরিসমাপ্তিতেও সেই একই

www.pathagar.com

স্থানে অবস্থান করে। এরা অবস্থানচ্যুত হতে পারে না। উদ্ভিদ জগতে ফুলের থেকে ফল সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পরাগায়নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি করে পরাগধানী সৃষ্টি করেছেন। এই পরাগধানীর ভেতরেই পরাগরেণু উৎপাদিত করেন। নির্দিষ্ট একটি সময়ে পরাগধানী যেন ফেটে যায় এবং পরাগরেণু কীট-পতঙ্গ ও বাতাসের মাধ্যমে একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি ফুলের গর্ভমুন্ডের সাথে যেন লেগে যায়, এ ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে পরাগায়ন (Pollination)।

মানবদেহ গঠন পদ্ধতি

মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, এই মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন–

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى–

মানুষ কি সেই সামান্যতম শূক্র ছিল না, যা সবেগে নির্গত হয়েছিল? (সূরা কিয়ামাহ্- ৩৭)

পক্ষান্তরে মানব দেহে এই শূক্র এলো কোত্থেকে? পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখি, এসবের মূল উপাদান হলো মাটি। মাটি থেকেই সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল আকাশের শূন্যগর্ভে যে উড়োজাহাজ চলাচল করে, তা যে উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছে, নির্মাণকালে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব বস্তুর মূল উপাদান মাটি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। যেমন লৌহ, তামা, দস্তা, পিতল, স্বর্ণ, কয়লা ইত্যাদির খনি মৃত্তিকা অভ্যন্তরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমশ অস্তিত্ব লাভ করে। কাঠ সংগৃহিত হয় গাছ থেকে। গাছ উৎপন্ন হচ্ছে মাটি থেকে। পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখছি, তা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন জাতবস্তু আল্লাহর দেয়া জ্ঞান প্রয়োগে পরিবর্তন করে মানুষ নবতর আবিষ্কার করেছে। সুতরাং, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আহার করে। দেহ এবং দেহের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা গঠিত হয় গ্রহণকৃত খাদ্যের সার নির্যাস থেকে। মানুষের দেহ থেকেই শূক্র নির্গত হয়, অতএব শূক্রের মূল উপাদান হলো মাটি। এ জন্যেই বলা হয় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে।

মানুষের দেহ গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবাক হয়ে যেতে হয়। অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে মানব দেহ গঠন করেছেন আল্লাহ–যিনি হলেন

www.pathagar.com

রব। লক্ষ লক্ষ কোষের মাধ্যমে গঠিত মানুষের দেহসৃষ্টি নৈপুন্যতায় এক অদ্ভূত জটিল সৃষ্টি। বিশাল একটি ইমারত যেমন একটির পর একটি ইট পাথর সাজিয়ে নির্মাণ করা হয়, তদ্রুপ মানুষের দেহে কোষের পর কোষ বিন্যাসের মাধ্যমে মানুষের দেহ কাঠামোটি গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই অসংখ্য কোষ সর্বপ্রথমে বিস্তৃতি লাভ করেছে একটি মাত্র কোষ থেকে। সূচনায় যা ছিল একটি পুরুষ প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে শুক্রাণু (Spermatozoon) এবং আরেকটি স্ত্রী প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে ডিম্বাণু (Ovum)। এই দুটো কোষের মিলিত হওয়াকে বলা হয়েছে নিষেক (Fertilization)। এ দুটো কোষ মিলিত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়েছে তাকে বলা হয়েছে জাইগোট (Zygote)। বিভাজনের মাধ্যমে এই জাইগোট মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্রমশঃ মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। মাতৃগর্ভের যে স্থানটির নাম জরায়ু (Uterus) সেখানে তা স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এটাকেই বলা হয়ে থাকে ভ্রূণ (Embryo)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً–

হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তোমাদের জুটি নির্বাচিত করেছেন এবং এই উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন নিছা-১)

মাতৃগর্ভে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এভাবে প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ অর্থাৎ দুই শত আশি দিন বা আরো কিছু কম সময়ের ব্যবধানে অপূর্ব সুন্দর মানব শিশু এই পৃথিবীতে আগমন করে। রব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ–

তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন নাহ্‌ল–৪)

এই আয়াতে 'নুৎফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির অনেক ধরনের অর্থ হতে পারে যা যথাস্থানে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণতঃ নুৎফা শব্দ দ্বারা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশে যে সমস্ত কোষ একটির পর আরেকটি সজ্জিত হয়ে মানব দেহ গঠিত হয়, তার ভেতরে নানা ধরনের জৈব পদার্থ বিদ্যমান

www.pathagar.com

থাকে। এসব পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং তার একটিকে বলা হয়েছে সাইটোপ্লাজম ও অপরটিকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করছে DNA (Deoxyribonucleic Acid)। মূলতঃ এজিনিসটিই হচ্ছে প্রাণীজগতের বংশগতির ধারক-বাহক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণীর ডিএনএ-কে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ফলে একটি প্রাণীর গর্ভ থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না। নারী দেহের একটি ডিম্বাণুর মধ্যে পুরুষ দেহের একটি শুক্রাণু প্রবেশ করে নিষেক ঘটাতে সক্ষম হলেই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এরপর এই ভ্রূণ নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে। আর এগুলো যিনি সুনিপুন দক্ষতার সাথে সম্পাদিত করেন, তিনিই হলেন আমাদের রব। আল্লাহ বলেন–

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا–

তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূহ–১৪)

মানুষ মাতৃগর্ভে কিভাবে অবস্থান করে এবং কয়টি পর্যায় অতিক্রম করে পৃথিবীতে আসে, বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ، ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ–

তিনিই মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক সজ্জিত করেছেন। তিনিই আল্লাহ–যিনি তোমাদের রব। প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার-৬)

তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর অতিক্রম করে এই মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। আধুনিক ভ্রূণ তত্ত্ববিদগণ মাতৃগর্ভে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভ্রূণ বিকাশের স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, যে তিনটি স্তরের কথা কোরআন বলেছে, তার প্রতিটি স্তর তিনটি পর্দা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এসব পর্দা মানব শিশুকে দেহ সম্পর্কিত নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে। এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা যিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বর্তমান মেডিকেল সাইন্স এই তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণকে বলেছে, জাইগোট, ব্লাষ্টোসিষ্ট ও ফিটাস (Zygote. Blastocyst. Foetus)। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি মানুষের দেহে যে কোষ রয়েছে, তার ভেতরে তেইশ জোড়া বা ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোম (Chromosome) বিদ্যমান। মানব শিশুর সূচনায় দেহ

www.pathagar.com

কোষে তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ হয় পিতার শুক্রাণু থেকে এবং আরো তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ করে মায়ের ডিম্বাণু। এই ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোমের মধ্যে তেইশটিকে বলা হয় দেহ ক্রোমোজোম (Autosome)। দেহ ক্রোমোজোমের মধ্যে বাইশ জোড়া ক্রোমোজোমের আকার ও কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা এক ও অভিন্ন। এই এক ও অভিন্ন ক্রোমোজোম মানব শিশুর দেহ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তারপর আরো যে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম (Sex chromosome), এগুলো মানব শিশুর যৌন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুরষ হবে না নারী হবে–তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই তেইশটি ক্রোমোজোমকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর একটি হলো মেইল ক্রোমোজোম (Male chromosome) ও অপরটি হলো ফিমেইল ক্রোমোজোম (Female chromosome)। বিজ্ঞানীগণ মেইল ক্রোমোজোমের পরিচিতি তুলে ধরেছেন ইংরেজী অক্ষরের ওয়াই (Y) অক্ষর দিয়ে এবং ফিমেইল ক্রোমোজোমের পরিচয় দিয়েছেন ইংরেজী অক্ষরের এক্স (X) অক্ষর দিয়ে। অর্থাৎ নারীর যৌন ক্রোমোজোমের সাংকেতিক চিহ্ন হলো দুটো এক্স (XX)। পক্ষান্তরে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের জোড়ায় একটি এক্স ও অন্যটি ওয়াই বিদ্যমান রয়েছে (XY)। এভাবে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের পরিচিতি দেয়া হয়েছে একটি এক্স ও একটি ওয়াই দিয়ে। এই যৌন ক্রোমোজোমের কারণেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেহগত বাহ্যিক আকৃতি–বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের অভ্যন্তরীস্থ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই অকল্পনীয় জটিল বিষয়টি যিনি সুনিপুনভাবে সম্পাদন করেছেন, তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ–

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রকীট থেকে। এরপর তোমাদেরকে জোড়ায় পরিণত করা হয়েছে। কোন নারী গর্ভবতী হয়না, না সন্তান প্রসব করে–এসব কিছু রয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে। (সূরা ফাতির–১১)

এভাবে জোড়া সৃষ্টি বা ক্রোমোজম সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত রহস্যময়। কিভাবে এটা সংঘটিত হয়, তা বিজ্ঞানীদের কাছে এক চরম বিস্ময়কর বিষয়। সমগ্র সৃষ্টি জগতসমূহের রব মহান আল্লাহ বলেন–

www.pathagar.com

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا، ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ، فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

আমি মানুষকে মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে একটি সুসংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর মাংসপিন্ডে অস্থি-পিঞ্জর স্থাপন করেছি। তারপর অস্থি-পিঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোস্ত দিয়ে। তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি হিসাবে। সুতরাং আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, সমস্ত শিল্পীর চেয়ে সর্বোত্তম শিল্পী তিনি। (সূরা মুমিনুন-১২-১৪)

উল্লেখিত আয়াতে 'সুলালাতিম মিন ত্বিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মাটির সার-নির্যাস। মাটি যেসব উপাদানে গঠিত তাহলো, ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালুমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২ দশমিক ৬ শতাংশ পটাশিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম। তারপর হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদরাজি তার মূলের সাহায্যে মাটির এসব উপাদান শোষণ করে। তারপর উদ্ভিদ থেকে যেসব খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা মানুষ খাদ্য হিসাবে আহার করে। পাকস্থলিতে এগুলো ডাইজেষ্ট হয়। গ্রহণকৃত খাদ্যের সার-নির্যাস থেকে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাশয়ে স্পার্ম্যাটাজোন (Spermatozoon) এবং নারীর ডিম্বাশয়ে (Ovary) ওভাম (Ovum) উৎপন্ন হয়। ওভাম-এর নিষেক থেকে সৃষ্টি হয় জাইগোট। এই জাইগোট নারীর জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে। জগতসমুহের রব মহান আল্লাহ এই ভ্রূণ থেকেই পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন।

জাইগোট গঠনের মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা নারীর বাচ্চা থলির দেয়ালে একটি ঘেরা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে। এরপর তা জ্যামিতিক হারে বিভাজন হতে থাকে এবং সময়ের ব্যবধানে তা জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয় এবং বিজ্ঞানীগণ এটাকেই

www.pathagar.com

ব্লাষ্টোসিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। এই ব্লাষ্টোসিষ্ট অনেকটা পানির জোঁকের মতো দেখায়। তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জোঁক রক্তপান করলে যেমন আকৃতি ধারণ করে, এটিও তেমন আকার ধারণ করে। এই ব্লাষ্টেসিষ্ট মায়ের রক্ত দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং মাতৃগর্ভের বাচ্চাথলির দেয়ালে ঝুলতে থাকে। ব্লাষ্টোসিষ্টের বাইরের যে স্তরটি তাকে বলা হয় ট্রফোব্লাষ্ট–এই ট্রফোব্লাষ্ট থেকে এক ধরনের এনজাইম নির্গত হতে থাকে।

এনজাইমের প্রভাবে বাচ্চাথলির টিসুগুলো গলে যায় এবং গলিত টিসুর ভেতরে ব্লাষ্টোসিষ্ট ডুবে যায়। এ সময় ব্লাষ্টোসিষ্ট পরিণত হয় মাংসপিন্ডে যাকে সুমিটেস বলা হয়। এ প্রক্রিয়া প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই সুমিটেসের শিরদাঁড়ায় তেরটি উঁচু নিচু দাগের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এটাই পরবর্তীতে মেরুদন্ডে পরিণত হয়। ছয় সপ্তাহের শেষ সময়ে এটা একটি মানব কঙ্কালের আকার ধারণ করে। বার সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ কঙ্কাল গঠিত হয় এবং এ কঙ্কালে সর্বমোট তিন শত ষাটটি জোড়া থাকে। মানুষের কঙ্কাল সর্বমোট দুই শত ছয়টি হাড় দিয়ে গঠিত। আট সপ্তাহের শেষের দিকে তা একটি পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকার ধারণ করে এবং ভ্রূণ তখন নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সুচারুরূপে মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভে মানুষের দেহ গঠনের কাজ সম্পাদন করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম রব। ভ্রূণকে রেখেছিলেন এমন একস্থানে যেখানে কোনো ধরনের রোগ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে না। এই স্থানটিকেই কোরআনে বলা হয়েছে, 'কারারিম মাকিন' বা সুসংরক্ষিত স্থান। সেখান থেকে শিশুকে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসা হলো, তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ –

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দিয়েছি। তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি। (আল কোরআন)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আস্‌সাজদার মধ্যে বলেছেন, মানুষের সৃষ্টির সূচনা তিনি করেছেন কাদা-মাটি থেকে। তারপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু

www.pathagar.com

করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। এরপর তিনি দেহের যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের প্রয়োজন তা সজ্জিত করে রুহ্ দান করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে জ্ঞান, চোখ এবং হৃদয় দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তার শরীরের ত্বকের ভেতরে স্পর্শ অনুভূতি এবং নাক দিয়েছি ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। তার যা যেখানে প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। তার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে তার জন্য অসীম মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছি। সে পৃথিবীতে চোখ খুলেই দেখতে পায়, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাকে প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সমস্ত কিছুই তার সেবায় নিয়োজিত করেছি। মানুষের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। মানুষের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন যোগ্যতা কারো ভেতরে বেশী দিয়েছি। আবার তা কারো ভেতরে কম দিয়েছি। এমন না করলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হত না। একজন মানুষ আরেকজনের পরোয়া করতো না এবং মানুষের যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন হত না।

যে জিনিষের প্রয়োজন যতবেশী মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর জন্য কর্মীর প্রয়োজন অধিক এবং মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনাপতি, তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন কম, আল্লাহ তা কম পরিমাণেই সৃষ্টি করেছেন। এ জাতিয় মানুষের সংখ্যা আল্লাহ ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেননি। কারণ, এসব মানুষের অবদান এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। এ জন্য এসব দুর্লভ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর জন্য যে কয়জন প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেছেন। তাদের একজনের যে অবদান, শতকোটি মানুষ ঐ একজন মানুষের চিন্তাধারা দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। এভাবে নানা ধরনের বিদ্যায় পারদর্শী মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, স্থপতি, শাসক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক তথা যে ধরনের গুণাবলী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আল্লাহ তা মানব জাতিকে দান করেছেন।

সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে এ পৃথিবীতে আগমন করবে, সন্তানের যারা অভিভাবক তাদেরকে পূর্ব থেকেই সন্তানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়নি। যিনি ঐ সন্তানকে প্রেরণ করছেন, তিনিই সন্তানের মায়ের বুকের ওপরে এমন এক খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার বিকল্প গোটা পৃথিবীতে নেই। মায়ের বুকের দুধের মধ্যে পানির ভাগ বেশী এবং সামান্য মিষ্টি থাকে যেন শিশু আগ্রহ সহকারে পান করে। আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'য়ালা এই দুধে পানির ভাগ বেশী না দিলে সদ্যজাত শিশু তা হজম করতে সক্ষম হতো না। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে পানি পান করালে তার নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। এ জন্য মহান রব আল্লাহ তা'য়ালা ঐ দুধের মধ্যেই পানি দিয়েছেন যেন শিশুকে পৃথকভাবে পানি পান করাতে না হয়।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর সর্বোত্তম ওষুধ

মাতৃদুগ্ধ শুধুই দুধ নয়, এই দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম ওষুধ। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মাতৃদুগ্ধ যেসব সন্তান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পান করার সুযোগ পেয়েছে, তারা রোগে খুব কমই আক্রান্ত হয় এবং এরা মেধাবী হয়। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, মায়ের দুধও ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রথমে মায়ের বুকে যে দুধ থাকে, অজ্ঞতার কারণে তা অনেকে ফেলে দেয়। অথচ ঐ দুধই হলো সন্তানের সমস্ত রোগের প্রতিষেধক। শিশু বড় হচ্ছে মায়ের দুধও ঘন হচ্ছে, এর কারণ হলো–প্রথমে দুধ ঘন হলে শিশু তা চুষে বের করতে পারবে না এবং সে ঘন দুধ তার অপরিপক্ক পাকস্থলীতে হজম হবে না। পাকস্থলী ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে, সেই সাথে মায়ের দুধও ঘন হতে থাকে। এভাবে শিশু যখন বাইরের খাদ্য আহার করতে সক্ষম হয়, তখন মায়ের দুধ ক্রমশঃ ঘন হতে হতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। মায়ের স্তনে একটি ছিদ্র নেই, একটি ছিদ্র থাকলে তা দিয়ে বেগে দুধ নির্গত হয়ে সন্তানের কণ্ঠনালীতে অসুবিধার সৃষ্টি করতো। এ জন্য মায়ের স্তনে আল্লাহ তা'য়ালা বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষা করে দুধ নির্গত হয় এবং শিশু তা পরম প্রশান্তিতে পান করতে সক্ষম হয়।

শিশু যখন বাইরের খাদ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো, তখন শক্ত খাদ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য মাড়িতে দাঁতের প্রয়োজন। এই দাঁতের জন্য আল্লাহর কাছে কারো আবেদন করতে হয়নি। তিনি এমন রব যে, তা না চাইতেই তিনি দিয়েছেন। মানুষের মাথার মগজ–যাকে ব্রেন বলা হয়ে থাকে। এই মগজ এমনভাবে মাথার খুলির ভেতরে রাখা হয়েছে, যেন তা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মগজের চারদিকে বেশ কয়েকটি আবরণ বা পর্দা নির্মাণ করা হয়েছে, এগুলো কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে বানানো হয়নি। এগুলো করা হয়েছে নরম এবং সিক্ত। ক্রীম যেভাবে পানির ভেতরে ভাসতে থাকে, মাথার মগজকে সেভাবে সিক্তাবস্থায় রাখা হয়েছে, যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। মানুষের মাথায় অসংখ্য সেল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা দেখলে হতবাক হতে হয়। তারপরেও কম্পিউটারের মেমোরির একটি

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের এই মাথা অনেকগুণ বেশী বিস্ময়কর। মানুষের মাথায় আল্লাহ যে মেমোরি দিয়েছেন, পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য এই মেমোরিতে রাখার পরও আরো বিশাল জায়গা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।

মানুষের চোখে কর্ম ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন। মানুষ রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি সাপ দেখে, তাহলে এই চোখ অত্যন্ত দ্রুত বিপদ সংকেত প্রেরণ করে ব্রেনকে। এই ব্রেন তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় করেছে পা ও হাতকে। সংকেত দিয়েছে হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকে তাহলে তা দিয়ে সাপকে আঘাত করতে হবে আর না থাকলে পায়ের শক্তিতে দৌড় দিতে হবে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিষয়টি এত অল্প সময়ের ভেতরে বাস্তবায়িত হয় যে, এতে কতটুকু সময় ব্যয় হলো তা মানুষের পক্ষে হিসাব করে বের করা অসম্ভব। চোখ সাপ দেখলো এবং সে মাথায় সংবাদ প্রেরণ করলো, মাথা পা ও হাতকে সক্রিয় করলো। এই পুরো বিষয়টি সংঘটিত হতে, এক সেকেন্ডেরও সময়ের প্রয়োজন হয়নি, এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সময় প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি সম্ভব করা কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষেই সম্ভব আর এ জন্যেই তাঁর যাবতীয় প্রশংসা।

আবার মানুষ তার চোখে যা দেখে তা নেগেটিভ ভঙ্গীতে দেখে থাকে। নেতিবাচক দৃশ্য ধরে চোখ তা ব্রেনে পৌছে দেয় এবং সেখান থেকে তা পজিটিভ হয়ে বের হয়ে আসে এবং মানুষ তখন স্পষ্ট দেখতে পায়। আল্লাহ হলেন রব এবং এসব ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। মানুষ তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে অসংখ্য শব্দ শুনে থাকে। কিন্তু অনেকগুলো শব্দ একই সাথে কানে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক কোন শব্দের সৃষ্টি করে না, কোন একটি শব্দও জড়িয়ে যায় না। মানুষের জিহ্বার গঠন প্রণালী এমন যে, জিহ্বা অসংখ্য স্বাদ গ্রহণ করতে ও পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অগণিত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এই মানুষের একজনের হাতের আঙ্গুলের রেখা আরেক জনের সাথে মিলবে না। হাতের আঙ্গুলের ছাপের বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞান কাজে লাগিয়েছে। বিশেষ করে কারো সম্পত্তি জাল হওয়া বা অপরাধীদের সনাক্তকরণের কাজে আঙ্গুলের ছাপ এবং বর্তমানে অধিকাংশ বিমান বন্দরেও যাত্রীর হাতের আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়। হাতের আঙ্গুলের ছাপ ও গিরার বিষয়টিও আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা কিয়ামাহ্য় বর্ণনা করেছেন। এ জন্য সেই রব-এরই প্রশংসা করতে হবে, যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

মানুষের নান্দনিক দেহ সৌষ্ঠব

মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালিনতা, কোন কিছু চাওয়ার পদ্ধতি, আহার করার শালীন পদ্ধতি, হাঁটা-উঠা-বসা এক কথায় মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক যেন সৌন্দর্যময় ও উন্নত রুচি গড়ে ওঠে, তা মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সুন্দর এবং সবচেয়ে প্রশংসামূলক রুচির অধিকারী, মানুষকেও তিনি তাঁর কোরআনের মাধ্যমে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ–

মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত-তীন-৪)

মানুষকে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যার সাথে অন্য কোন সৃষ্টির কোন তুলনা হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ–

তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের আকার -আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করেছেন। (সূরা আত তাগাবুন–৩)

শারীরিক কাঠামোয় যেখানে যা প্রয়োজন, সেখানে তাই সংযোজন করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অদ্ভূত সুন্দর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন–

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّه عَيْنَيْنِ، وَلِسَانًاوَّ شَفَتَيْنِ–

আমি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুটো ওষ্ঠ দেইনি? (সূরা বালাদ-৮-৯)

মানুষের শারীরিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী দেখে কারো এ কথা বলার মতো ধৃষ্টতা নেই যে, কান দুটো মাথার দু'পাশে না দিয়ে তা বগলের নিচে দিলে ভালো হতো। চোখ দুটো কপালের নিচে টানা টানা করে না দিয়ে কপালের ওপরে গোল বৃত্তের মতো করে দিলে ভালো হতো। নাকটা ঠোঁটের ওপরে না দিয়ে নাভীর ওপরে দিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতো। ফুলের পাঁপড়ীগুলো ভিন্ন ধরনের হলে আরো সুন্দর দেখাতো। চতুষ্পদ প্রাণীর লেজ পেছনের দিকে না দিয়ে তা পিঠের ওপরে থাকলে ভালো হতো। এ ধরনের অমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য রয়েছে, এমন চিন্তাও করা যায় না। যেখানে যা

www.pathagar.com

প্রয়োজন, আল্লাহ তাই করেছেন। কথিত আছে, আল্লাহর একজন ওলী পথ দিয়ে যেতে যেতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্রামের জন্য একটি বট গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে বট গাছের ফল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি চিন্তা করলেন, এত বড় একটি বিশাল গাছ, আর তার ফলগুলো কতই না ছোট্ট। মনে মনে তিনি আল্লাহকে বললেন, 'তোমার সৃষ্টিতে তো কোন অসামঞ্জ্য নেই–এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বেল গাছ এই বট গাছের তুলনায় কত ছোট অথচ তার ফলগুলো বেশ বড়। আর বট গাছ কত বিশাল কিন্তু তার ফল খুবই ছোট। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন....!'

আল্লাহর সেই ওলী মনে মনে আল্লাহকে যে কথাগুলো বলছিলেন, তা শেষ না হতেই বাতাসের এক ঝাপটা এসে বট গাছের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাতাসের ঝাপটায় বট গাছের একটি ছোট্ট ফল গাছের নিচে শায়িত সেই ব্যক্তির নাকের ওপরে এসে পতিত হলো। সাথে সাথে আল্লাহর ওলী উঠে সিজদায় গিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার কল্পনা অনুযায়ী এই বট গাছের ফল যদি গাছ অনুসারে বড় হতো, তাহলে আজ আমার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো এবং তোমার বান্দারা সূর্যের প্রখর তাপে নিঃশেষে জ্বলে পুড়ে গেলেও কেউ এই গাছের নিচে ছায়ায় বিশ্রামের জন্য আসতো না।'

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসামঞ্জ্যতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوتٍ طِبَاقًا، مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ، هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ–

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা আল মুল্‌ক- ৩-৪)

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা সৃষ্টির এই অপরূপ দর্শনে আত্মহারা হয়ে ওঠে। নারীর সৌন্দর্য অবলোকনে অস্থির চিত্তে তারা কবিতা রচনা করে।

www.pathagar.com

প্রজাপতির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা প্রশংসামূলক গীত রচনা করে। আকাশের নীল রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, বনানীতে বাতাসের হিন্দোল, দূরনিহারিকা কুঞ্জের পলায়নপর আলো, শশধরের মায়াবী কিরণ, দক্ষিণা মলয় সমিরণ, ফুলের মন মাতানো সৌরভ আর পাখির কলকাকলীতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে। কিন্তু এসবের যিনি মূল স্রষ্টা, যিনি পাখির কণ্ঠে গান দিয়েছেন, অরণ্যের মাঝে যিনি সবুজাভা দান করেছেন, সাগর তরঙ্গে যিনি রজত শুভ্র কিরীট দান করেছেন, নক্ষত্রপুঞ্জে যিনি আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করেছেন, চাঁদের মাঝে যিনি স্নিগ্ধ কিরণ দিয়েছেন, সমিরণ মাঝে যিনি প্রশান্তির স্পর্শ-আবেশ সৃষ্টি করেছেন, ফুলের পাঁপড়ীকে যিনি মাধুরী আর সুষমামন্ডিত করেছেন তাঁর প্রশংসা করতে ভুলে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশংসায় কোন কার্পণ্য নেই, কিন্তু স্রষ্টার প্রশংসায় জিহ্বায় জড়তা নেমে আসে। সুতরাং, আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দর্শন করে যারা তাঁর প্রশংসা করতে কার্পণ্য করে, তারা নিকৃষ্ট রুচি আর হীন মানসিকতারই পরিচয় দিয়ে থাকে।

সকল প্রশংসা একমাত্র সেই মহাবৈজ্ঞানিকের

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক, এ বিশ্ব প্রকৃতিতে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে নিপুণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এসবের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ-ই প্রশংসার অধিকারী। এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগৎ যে কোন বস্তু থেকে উপকারিতা লাভ করছে, লাভবান হচ্ছে, আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য অন্যান্য প্রাণীসমূহ যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, মানুষকেও আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর দাসত্ব করতে হবে। যাবতীয় সৌন্দর্যের পেছনে এক আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্য কারো কোন ভূমিকা নেই, তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ–

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের মালিক এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য। (সূরা সাবা-১)

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে কারো কোন অংশ নেই, সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে এ কথাটিই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে একক কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। এ জন্য সমস্ত

www.pathagar.com

প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। (সূরা ফাতির-১)

একশ্রেণীর মানুষ বোঝে না, না বুঝে আল্লাহর সৃষ্টি কাজে অন্যের অংশ আছে বলে বিশ্বাস করে। তারা ধারণা করে, সৃষ্টি কাজে আল্লাহকে সহযোগিতা করার জন্য স্বয়ং আল্লাহই অনেককে নিয়োগ করেছেন। তারাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। এ জন্য তাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। এভাবে অজ্ঞ মূর্খ মানুষ কল্পিত শক্তির মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে মাথানত করে দেয়। মাটির নিষ্প্রাণ মূর্তির প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এদেরকে ভ্রান্তিমুক্ত করার জন্য মহান আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তারা যেসব কথা তৈরী করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের জন্য। (সূরা সাফ্ফাত-১৮০-১৮২)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমরা নিজের হাতে যেসব মূর্তি নির্মাণ করো, তাদের যে কোন ক্ষমতা নেই, তা তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারো। তাদের দেহে মাছি বসলে তারা সে মাছিকেও তাড়াতে অক্ষম তা তোমরা দেখছো। তোমরা যেসব জিনিসকে শক্তির উৎস বলে তার পূজা-অর্চনা করছো, তা ধ্বংসশীল, তারা কিভাবে ধ্বংস হয় সে দৃশ্য তোমরা নিজেদের চোখে দেখে থাকো। এসব দেখেও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো না? সুতরাং, দাসত্ব ও প্রশংসা করো ঐ আল্লাহর–যিনি অমর অক্ষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমাদের দ্বীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (সূরা মুমিন)

www.pathagar.com

প্রশংসা করো একমাত্র আমার এবং দাসত্ব করো শুধু আমারই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়ম-পদ্ধতি আমার বিধানের অনুগত করে দাও। আমার একনিষ্ঠ গোলাম হয়ে যাও। আমার গোলামীর সাথে অন্য কারো গোলামীর মিশ্রণ ঘটিয়ো না। এ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছুই তোমরা দেখছো, এসবের মালিক আমি। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আমারই হাতে নিবদ্ধ। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্বজাহানের সবার রব্ব। (সূরা আল জাসিয়া-৩৬)

এ পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু এমন রয়েছে, যাদেরকে জড়পদার্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এসব বস্তুর ভেতরে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। এসব প্রাণহীন বস্তুও মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আকাশের মেঘমালাও আল্লাহর প্রশংসা করে। ঈশান কোণে কালবৈশাখীর নিকষকালো মেঘ রুদ্র ভয়াল রূপ ধারণ করে ক্রমশঃ গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলে। ভয়ঙ্কর গর্জন করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ–

মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। (সূরা আর-রা'দ-১৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত যে সুন্দর, তা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনুভব করা যায়। যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, তিনি কত সুন্দর হতে পারেন তা কল্পনাও করা যায় না। মনের গহীনে কল্পনার কুঞ্জবনেও মানুষ আল্লাহর রুচি ও শৈল্পিক জ্ঞান সম্পর্কে ছায়াপাত ঘটাতে সক্ষম নয়। সমুদ্রের অতল তলদেশে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকারের মাছের সমাহার রয়েছে সমুদ্রে। এসব মাছের দেহের সৌন্দর্য দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। আল্লাহভীরু লোকদের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয় 'আল হাম্‌দুলিল্লাহ'। সৌন্দর্যের পূজারীরা এসব মাছ ক্রয় করে এ্যাকুইরিয়ামে রেখে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত এসব মাছ শুধুই তাকিয়ে দেখে এক শ্রেণীর লোক। তাদের মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যে মাছগুলো মানুষের চোখের সামনে বিচিত্র ভঙ্গীতে পানির ভেতরে সাঁতার কেটে ফিরছে, তারা এক মুহূর্ত নীরব নেই। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তারা ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করছে।

www.pathagar.com

ঐ দূর নীলিমায় পাখিরা ডানা মেলে দিয়ে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে উড়ছে। মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে কিভাবে পাখিগুলো মহাশূন্যে উড়ছে। পাখিদের ওড়ার এই দৃশ্য দেখে অকৃতজ্ঞ মানুষ হতবাক হয়ে থাকলেও উড়ন্ত পাখিগুলো কিন্তু নীরব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَه مَنْ فِى السَّمٰوتِ وَالاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ–

তুমি কি দেখো না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে। (সূরা নূর-৪১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। তিনি আপন কুদরতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوتِ وَمَا فِى الاَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

আল্লাহর তাস্‌বীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজ করছে। তিনিই সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। (সূরা আস-সফ্–১)

আকাশমন্ডলে মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র, অগণিত তারকারাজি এবং গ্যালাক্সি (Galaxy) রয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এসবের রহস্য সন্ধানে ব্যপৃত রয়েছেন। তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (Telescope) সাহায্যে তা অবলোকন করছেন। মহান আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসা করছে। পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর এবং এসবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছু তাদের নিজস্ব ভাষায় মহান আল্লাহর তাসবীহ করে যাচ্ছে। মানুষকেও তাঁরই প্রশংসা করার জন্য এসব বিষয় কোরআনে তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوتِ وَمَا فِى الاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمُ–

www.pathagar.com

আল্লাহর তাস্‌বীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে। তিনি রাজাধিরাজ; অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। (সূরা জুম'আ–১)

তিনি নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। কোন শক্তি তাঁর এই সীমাহীন কুদরতকে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করতে পারে না। এই সমগ্র বিশ্বলোক তাঁরই এক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য। তিনি এ পৃথিবীকে একবারই পরিচালিত করে দিয়ে এর থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। তিনিই এর ওপর নিরন্তর শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এই শাসন -প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে অন্য কারো এক বিন্দু অংশীদারীত্ব নেই। অন্য কারো অস্থায়ীভাবেও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বিশ্বলোকের কোন স্থানে সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা, মালিকানা ভোগ করা অথবা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা যদিও কিছুটা থেকে থাকে, তা সে স্বয়ং অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, আল্লাহর পক্ষ থেকেই তা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন এই ক্ষমতা দিয়ে রাখবেন। আর যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন, তখনই ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় করে দেবেন।

সুতরাং, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই তা লাভের যোগ্য। শুধু তিনিই প্রশংসা লাভের অধিকারী। অন্য কোন সত্তায় যদি প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহলে তা তাঁরই অবদান। তিনি দান করেছেন বলেই তাতে সৌন্দর্য বিদ্যমান। অতএব কৃতজ্ঞতা লাভের প্রকৃত ও একমাত্র অধিকারী তিনিই। কারণ সর্বপ্রকার নিয়ামত তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই অবদান। সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রকৃত কল্যাণকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। অন্য কারো কোন উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেও তা এই হিসাবে করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মাধ্যমে। কেননা, সে নিয়ামতের প্রকৃত স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এবং তিনি সুযোগ না দিলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কোনক্রমেই উপকার করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং কোন মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হলেও আল্লাহরই প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক। মহান আল্লাহ বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

আল্লাহর তাসবীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন

www.pathagar.com

প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। বাদশাহী তাঁরই এবং তারীফ-প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের ওপরে কর্তৃত্বের অধিকারী। (সূরা তাগাবুন-১)

যাবতীয় সৃষ্টিতেই রয়েছে সুন্দরের ছোঁয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে অসুন্দর দেখতে চান না। তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর ভেতরেই সৌন্দর্য বিদ্যমান। আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বলোকে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র দেখা যায়। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দুটো ফলের বর্ণ, বাহ্যিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে তার ভেতরে নানা রংয়ের সমাহার। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে অদ্ভূত ধরনের পার্থক্য বিরাজমান। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একই জনক-জননীর দুটো সন্তানও একই ধরনের হয় না। পৃথিবীতে শতকোটি মানুষ, একজনের সাথে আরেকজনের চেহারার কোন মিল নেই। স্বভাবগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। সৃষ্টির এই বৈচিত্র ও বিরোধই স্পষ্ট করে আঙ্গুলি সংকেত করছে, এ সৃষ্টিজগতকে কোন মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানী বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন দৃষ্টান্তহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী।

সে অতুলনীয় নির্মাণ কৌশলী একই জিনিসের শুধুমাত্র একটি নমুনা জ্ঞানের জগতে ধারণ করে সৃষ্টি কাজ সম্পাদনে আদেশ দেননি। বরং তাঁর জ্ঞানের দর্পণে প্রতিটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন নমুনা, প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত রয়েছে। বিশেষ করে মানবিক স্বভাব, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে যে কোন ব্যক্তি এ কথা অনুভব করতে সক্ষম যে, সৃষ্টির এই নিপুণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞান-কুশলতার প্রকাশ্য নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক প্রবৃত্তি ও কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো, কোন প্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোন পার্থক্য রাখা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন এ পৃথিবীতে একটি কর্তব্য পরায়ণ-দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

করেছেন, তখন মানুষের সৃষ্টিগত কাঠামোর ভেতরে সব ধরনের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে সিদ্ধান্তের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও পরিকল্পনাহীনতার ফসল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, তা মানুষের স্বভাবগত বিচিত্রতা ও বিভিন্নতাই প্রমাণ বহন করে। এখানে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেখানেই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দৃষ্টিগোচর হবে, সেখানেই অনিবার্যভাবে সে পরিকল্পনার পশ্চাতে এক বিজ্ঞানময় প্রতিষ্ঠিত সত্তার সক্রিয় সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে। বিজ্ঞানী ব্যতীত যেমন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টির পেছনে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বও অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র ও নিপুণতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذَالِكَ–

তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের–সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, জীব–জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে। (সূরা ফাতির–২৭-২৮)

স্রষ্টার শৈল্পিক ও নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ

এ বিষয়টি কিভাবে সংঘটিত হয়, তা অবলোকন করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়েও এই একটি মাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর; কত যে প্রশংসামূলক, তা দেখে যেমন হতবাক হতে হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না। ফুলসমূহের চলৎশক্তি নেই; তারা চলাফেরার মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাধ্যমে, পানির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমর, মৌমাছি ও সুদর্শন দৃষ্টি-নন্দন প্রজাপতির মাধ্যমে ফুলের পুরুষ কেশরকে স্ত্রী কেশরের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ সর্বভূক প্রাণী আরশোলা–তেলাপোকাকে দেননি। কারণ তাঁর বান্দারা এই ফুলের সৌরভ গ্রহণ করে, ফুল দেখতে সুন্দর আর এ জন্য ফুলের ওপর বিচরণ করে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন দৃষ্টি নান্দনিক প্রজাপতির ওপরে এবং মৌমাছি আর ভ্রমরের ওপরে।

কি অপূর্বদর্শন এই ভ্রমর আর প্রজাপতি। এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে তার দেহে অপূর্ব সৌন্দর্যের পশরা অঙ্কন করেছে। শত সহস্র প্রজাপতি; একটি প্রজাতির সাথে আরেকটি প্রজাতির রংয়ের কোন মিল নেই। আল্লাহ সুন্দর এবং ফুলও সুন্দর, এই সুন্দর ফুলগুলোর ওপরে কুৎসিত দর্শন এবং নোংরা কোন প্রাণী বিচরণ করে পরাগায়ন ঘটালে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ ক্ষুন্ন হতো। ফুলের সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহান আল্লাহ অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিকেই নির্বাচিত করেছেন, তারা গোটা বিশ্বব্যাপী পরাগায়ন ঘটাবে। মহান আল্লাহর রুচিবোধ যে কত সুন্দর, কত মার্জিত ও উন্নত রুচি, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহকে কেউ যদি চিনতে চায়, কেউ যদি তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য আর সামঞ্জস্যতা দেখে মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হতে থাকবে–আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন- সকল প্রশংশা একমাত্র আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের রব।

পৃথিবীর সকল ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এমন কোন একটি ফলও পাওয়া যাবে না, যে ফলের ওপরে আবরণ নেই। সমস্ত ফলের ওপরে আবরণ রয়েছে। মনে হয় যেন মানুষ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান, আর মেহমানের সামনে তিনি খাদ্যগুলো পরিবেশন করছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। আবরণহীন ফলের ওপরে নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ বসবে; তারা মলমূত্র ত্যাগ করবে, ফলগুলো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তা খেতে রুচি হবে না। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি ফলের ওপরেই আবরণ সৃষ্টি করেছেন। যেন ফলের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে এবং খেতেও রুচিতে না বাধে। একটি বেদানার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বেদানার দানাগুলোর ওপরে বেশ কয়েকটি আবরণ রয়েছে। ওপরের আবরণটি সবচেয়ে ঘন আর মোটা। তারপরের আবরণগুলো পাতলা। এগুলো ছিন্ন করার পরেই রসে ভরা দানাগুলো বের হবে। নারিকেলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তার প্রথম আবরণটি খোসার আকারে বিদ্যমান এবং সেটা খুবই মোটা। এরপর রয়েছে একটি খোলা জাতিয় শক্ত আবরণ। এসব ছিন্ন করার পরই পাওয়া যাবে সুস্বাদু নারিকেল আর শরবত। ছোট্ট একটি ফল আঙ্গুর, তার ওপরেও আবরণ রয়েছে। চালের ওপরেও

www.pathagar.com

রয়েছে অনেকগুলো আবরণ। এসব সৃষ্টির সাথে কতটা উন্নত রুচি জড়িত, তা সৃষ্টির ধরণ দেখলেই অনুমান করা যেতে পারে।

সত্যের অনুসারী সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ নিখিল বিশ্বের অনু-পরমাণু থেকে শুরু করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ঐ বিশাল আকাশ পর্যন্ত এবং বৃক্ষ-তরু-লতা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণীজগতের অপূর্ব গঠন প্রণালী তার দৃষ্টির সামনে দেখতে পায়, তখন তার মুখ থেকে নিজের অগোচরেই বেরিয়ে আসে–আল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন- সকল প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ، الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেসব বিচক্ষণ-জ্ঞানী লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে ও শুতে–যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে–আমাদের রব্ব ! এসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯০-১৯১)

মানুষ নিজেকেও সুন্দর করে সাজাতে জানতো না। কোরআন শরীফ বলছে, মহান আল্লাহ এই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছেন, পাখির দেহে একটির পর আরেকটি পালক সজ্জিত করে পাখির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। পাখির পালকগুলো যেন সুন্দর ঝকঝকে থাকে, পালকে কোন ময়লা-আবর্জনা যেন স্থির থাকতে না পারে, এ জন্য আল্লাহ ঐ পালকের গোড়া থেকে ক্রীম জাতিয় এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত করার ব্যবস্থা করেছেন। পালকধারী প্রাণীগুলো তা নিজের মুখ দিয়ে পালকের গোড়া থেকে টেনে টেনে ঐ পিচ্ছিল পদার্থ সমস্ত পালকে ছড়িয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা যদি আল্লাহ না করতেন, তাহলে হাঁস, মুরগী, কবুতর এবং অন্যান্য যেসব পাখি মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, সেসব প্রাণী

www.pathagar.com

দেখতে শুষ্ক মৃতের মতো হতো। মানুষের খেতে তা রুচিতে বাধতো। এই সৌন্দর্য আর রুচিবোধের যিনি পরিচয় দিলেন তিনিই হলেন আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

বস্ত্রহীন থাকলে মানুষকে ভীষণ কদাকার ও কুৎসিত দেখাবে। এ জন্য আল্লাহ পোষাক অবতীর্ণ করেছেন। এই পোষাকের মাধ্যমে মানুষ নিজের লজ্জাস্থান আবৃত রাখবে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ বলেন–

يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا–

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। (সূরা আল আ'রাফ–২৬)

এই পোষাক অবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করলে অরুচিকর দেখাবে। এ জন্য তা পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, মহান আল্লাহ সূরা মুদ্দাচ্ছিরের মাধ্যমে তাও শিক্ষা দিয়েছেন। অজ্ঞতার কারণে তাদানীন্তন যুগে একশ্রেণীর লোকজন বস্ত্রহীন হয়ে কা'বাঘরকে তাওয়াফ করতো। বিষয়টি ছিল চরম অরুচিকর এবং অসামাজিক। এ কুপ্রথা বন্ধ করে পোষাকে সজ্জিত হয়ে ইবাদাতের হক আদায় করতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন–

يَابَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ–

হে আদম সন্তান! প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। (সূরা আল আরাফ-৩১)

উপসংহার

মহাগ্রন্থ আল কোরআন গবেষণা করার মতো সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا–

তারা কি মনোযোগ সহকারে কোরআন নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলো তালা লাগানো রয়েছে? (আল কোরআন)

উপসংহারে আমরা বলতে চাই, কয়েক বছর পূর্বে একজন আরব মুসলিম স্কলার

www.pathagar.com

ডক্টর তারেক আল সুয়াইদান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দের ওপর গবেষণা করে বিস্ময়কর পরিসংখ্যানগত উপাত্ত (Statistical Data) লাভ করেছেন। যা তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি। সমগ্র কোরআন মাজীদে–

الدنيا 'ইহজগত' তথা দুনিয়া শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫ বার।

الاخرة 'পরজগত' তথা আখিরাত শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫ বার।

الملئكة 'মালায়িকা তথা ফিরিশতাগণ শব্দটি এসেছে ৮৮ বার।

الشيطان 'শয়তান' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৮৮ বার।

الحياة 'হায়াত' বা জীবন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৪৫ বার।

الموت 'আল মাউত' বা মৃত্যু শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৫।

النفع 'আন নাফ্'উ' বা উপকারী শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ৫০ বার।

الفساد 'আল ফাসাদ' বা ক্ষতিকর শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ৫০।

الناس 'নাস' বা জনগণ শব্দটি এসেছে ৩৬৮ বার।

الرّسول 'রাসূল' বা রাসূলগণ শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৮।

الزكوة 'যাকাত' শব্দটি এসেছে ৩২ বার।

البركة 'বরকত' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩২।

اللسان 'আল লিছান' বা জিহ্বা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ২৫ বার।

الموعظة 'আল মাও'ইযাত' তথা উত্তম বাক্য শব্দটিও এসেছে ২৫।

الرجل 'আর রাজুল' বা পুরুষ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ বার।

المرأة 'আল মারাআত' তথা নারী শব্দটিও এসেছে ২৪ বার।

الشهر 'আশ্ শাহ্র' তথা মাস শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ১২ বার।

www.pathagar.com

اليوم 'আল ইয়াওম' তথা দিন শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৫ বার।

الامر 'আল আমর' বা আদেশ শব্দটি এসেছে ১,০০০ বার।

النهى 'আন্ নাহি' বা নিষেধ শব্দটিও এসেছে ১,০০০ বার।

الحلال 'হালাল' বা বৈধ শব্দটি এসেছে ২৫০ বার।

حرام 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ২৫০ বার।

جنّت 'জান্নাত' দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতিমূলক কথা এসেছে ১,০০০ বার।

جهنّم 'জাহান্নাম' সম্পর্কিত ভীতি প্রদর্শনমূলক কথাও এসেছে ১,০০০ বার।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে রহস্যময় গাণিতিক সূত্রে গ্রথিত এমন বিস্ময়কর কিতাব সমগ্র বিশ্বে আর একটিও নেই। মহান আল্লাহ কোরআনের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا–

এরা কি কোরআন (ও তার সূত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করেনা? এ গ্রন্থটি যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেতো। (সূরা আননিসা-৮২)

কোরআন বিশাল এক মু'জিজাহ্, এর বিস্ময়কারিতার কোনো শেষ নেই, এর ব্যাখ্যারও কোনো শেষ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِه مَدَدًا–

(হে নবী) আপনি (এদের) বলুন, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের জ্ঞানের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি করে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)। (সূরা কাহ্ফ- ১০৯)

www.pathagar.com

اِنَّه لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ–

অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী (চূড়ান্ত কথা, তা অর্থহীন (কোনো কথাবার্তা) নয়। (সূরা তারিক- ১৩-১৪)

আরবী শব্দের যথার্থ অর্থ এবং একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ এবং যথার্থ স্থানে এর প্রয়োগ- জ্ঞানের অভাবজনিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের যে অনুবাদসমূহ হয়েছে, তা মাতৃভাষায় পাঠ করে অনেকেই ভ্রান্তির শিকার হন। এ কারণে কোরআনকে যথার্থ অর্থে বুঝতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে অথবা যিনি পারদর্শী তার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। অথবা যথার্থ অনুবাদ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে। তবে এ বিষয়টি মাথায় রেখে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, এ কোরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। এটি হিদায়াতের গ্রন্থ, মানব জাতির জীবন বিধান এবং মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বর্ণনা সম্বলিত কিতাব।

কোরআন আল্লাহর বাণী কিনা এ বিষয়ে যারা সন্দেহ পোষন করেন, তাদেরকে অনুরোধ করবো আধুনিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করুন অথবা কোরআন ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্বলিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে, কোরআনের সত্যতা বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে যাবার মতো বোকামী যেনো কেউ না করেন। বরং বিজ্ঞানের সত্যতাকে অবশ্যই কোরআন দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান যা কিছু বলছে, তা অন্ধের মতো বিশ্বাস করা যাবে না।

কিছু সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞানের থিউরীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখেন এবং বিজ্ঞানের সুত্র দিয়ে আলেম-ওলামাদের ঘায়েল করার ঘৃণ্য মানসিকতা পোষণ করেন। তাদের জ্ঞান দৃষ্টি উন্মোচন করার লক্ষ্যেই আমি এ গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সামান্য কয়েকটি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আমার আলোচনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে, কারো দৃষ্টিতে তেমন ভুল ধরা পড়লে তার সঠিক তথ্য আমাকে জানাতে অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আমার এ আলোচনায় একজন মানুষও যদি আল কোরআনের পথ অনুসরণের তাগিদ অনুভব করে, তাহলে এটা হবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক অতুলনীয় পুরস্কার। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন- আমীন।

www.pathagar.com

ISBN 984 8383 07 7

www.pathagar.com